পরিচয়

আষাঢ় ১৩৬৭

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

২৯শ বর্ষ ॥ আষাঢ়, ১৮৮২ ; ১৩৬৭ ॥ ১২শ সংখ্যা

॥ সম্পাদক ॥

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং 'পরিচয়' কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



জন্ম: ১৯০১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যু: ১৯৬০

পরিচয়
২৯ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা
আষাঢ় ১৮৮২ : ১৩৬৭

সুধীন্দ্রনাথ স্মরণে

'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর নেই। তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যজগতের একটি দীপ নির্বাপিত হল।

সুধীন্দ্রনাথ কবি, মনস্বী, আত্ম-সচেতন ব্যক্তিত্বের আজন্ম অধিকারী। 'পরিচয়'-এর পক্ষে এ সত্য ঘোষণা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু 'পরিচয়'-এর আবির্ভাবের পূর্বেও এ সত্য গোপন ছিল না, আর তাঁর জীবনান্তেও আজ তা পুনঃপুনঃ স্মরণীয়। জন্মগত মনীষাকে সুধীন্দ্রনাথ আকৈশোর সাধনায় সুস্থিত রূপ দান করেন। সাহিত্য-ধর্মের এরূপ সাধনা বাঙলা সাহিত্যে যেমন বিরল তেমনি আবশ্যক।

আশ্চর্য নয় যে, পরিমাণের প্রাচুর্য এ-জাতীয় সাহিত্য-ধর্মের প্রার্থিত নয়। প্রতিভার পর্যাপ্ত প্রকাশই ছিল সুধীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। সেই প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যে জুগিয়েছে অভিনব দান: কবিতার ক্লাসিক গঠন, সংযম ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা, অভিনব শব্দ-চয়নে ও শব্দ-উদ্ভাবনায় তৎপরতা। এ সার্থকতার স্থির পরিমাপ এখনো সম্ভব নয়, এ মুহূর্তে তা অনাবশ্যকও। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার পথ-নির্বাচনে সুধীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় সৃষ্টি ও দৃষ্টি অনুবর্তীদেরও এখনও আদরণীয়—একথা সুবিদিত।

সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা, তার প্রথম সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী। 'পরিচয়' একাদশ বৎসর কাল শুধু তাঁর সৃষ্টি-শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করে নি, বহন করেছে তাঁর সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধের, অক্লান্ত পরিশ্রমের ও সুমার্জিত পরিশীলনেরও প্রমাণ। ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' বাঙলা সাহিত্যপত্রের জগতে ও যুগ-ভাবনার বিকাশে এক অভূতপূর্ব প্রকাশ—মাসিক পত্রাকারেও সুধীন্দ্রনাথ ও

তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী সে গৌরব অম্লান রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সে ঐতিহ্য দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখা কালের নিয়মেই হয়তো অসম্ভব। তথাপি সেই প্রথম যুগের ঐতিহ্যকে নতুন কালের ইতিহাসের বাহকরূপে লাভ করাই 'পরিচয়'-এর প্রার্থিত। সেই ঐতিহ্যের যাঁরা স্রষ্টা, সুধীন্দ্রনাথ ও বন্ধুগোষ্ঠী, তাঁদের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর সম্পর্ক যেমন ঐতিহাসিক, তাঁদের নিকট 'পরিচয়'-এর কৃতজ্ঞতাও তেমনি অপরিশেষ। সুধীন্দ্রনাথের জীবন-শেষেও তাই 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয় না।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন 'পরিচয়-গোষ্ঠীর' মধ্যমণি এবং তাঁর কালের বিদগ্ধ-সমাজের শ্রেষ্ঠ সতীর্থ। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-ভাবনার এমন ব্যাপক বৈদগ্ধ্য নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে ইদানীং আর কেউ প্রবেশ করেন নি; তাঁর কালে এমন সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব নিয়েও আর কেউ সাহিত্যক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।

'পরিচয়-গোষ্ঠীর' সহযোগিগণ আজ শোক-বিহ্বল। বন্ধুকৃত্য তাঁরা যথাসময়ে পালন করবেন। 'পরিচয়' আজ শোকার্ত হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

জীবনপঞ্জী

জন্ম: ১৯০১, ৩০শে অক্টোবর; পিতা স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিক্ষা: বারাণসীতে অ্যানি বেসান্তের তত্ত্বাবধানে; কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে; বি-এ—১৯২২।

সাহিত্য-জীবন: রবীন্দ্র-সান্নিধ্য; আমেরিকা ও বিদেশ ভ্রমণ ১৯২৯। 'পরিচয়' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা—১৯৩০-১৯৪১ (প্রথম ১১ বৎসর কাল)।

রচনা: তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত, প্রতিধ্বনি, দশমী (কাব্যগ্রন্থ); স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ (প্রবন্ধ পুস্তক)।

কর্মজীবন: সাময়িকভাবে পিতার এটর্নী আপিস, বীমা কোম্পানি, যুদ্ধকালে এ-আর-পি, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (১৯৪৯), ইনস্টিটিউট অব্ পাব্লিক ওপিনিয়ন (১৯৫৫), এবং সর্বশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৬) যোগদান করেন—১৯৫৭-৫৯এ শিকাগোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপেও নিযুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু: ১৯৬০ ইং ২৫শে জুন, প্রত্যূষ-কাল।

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অধ্যাপক হোয়াইটহেড্ ইউরোপের ইতিহাসে ১৭ শতককে বলেছেন "দি সেঞ্চুরি অব জিনিয়াস্" অর্থাৎ প্রতিভার যুগ। বাংলাদেশে 'প্রতিভার যুগ' নিশ্চয়ই উনিশ শতক। এমন সৃষ্টিশীল ও যুগান্তকারী কাল বাংলার ইতিহাসে বেশি আসেনি। এ যুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির উন্মেষ। সমাজ ও ধর্মজীবনে এ যুগে নূতন আলোড়ন। জ্ঞানে, কর্মে, সাহিত্যে, নাট্য-আন্দোলনে—সর্বত্র, এ যুগে নূতন সৃষ্টিশীল প্রয়াস। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, বিভিন্নভাবে জাতীয়তার অঙ্কুরোদ্গম। এই অঙ্কুর পরবর্তীকালে শাখাপ্রশাখা সংবলিত বিরাট মহীরুহের রূপ ধারণ করেছে। শুধু ইতিহাসের সন তারিখ মিলিয়েই এ যুগের বিপুল বিস্তারের পরিচয় দেওয়া সম্ভব। এবং ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে এ যুগ অনেকখানি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়, আন্তরধর্মের বিচারে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে (১৮২০—১৮৯১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের যে-আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক, সে-আন্দোলনও এই যুগে দানা বেঁধে ওঠে। উত্তরপুরুষদের জন্য বিদ্যাসাগর যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের অসামান্য চারিত্র মর্যাদা, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা, অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। অথচ, শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির, এমনকি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিরিখে তাঁর

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)। বিনয় ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চরিত্রের সামগ্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। ১৮২০ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবনের তরঙ্গায়িত গতির মধ্যে বাংলার সামাজিক জীবন কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, বাঙালী সমাজের রূপান্তরের ঐতিহাসিক দিক্‌নির্ণয় বিদ্যাসাগর তাঁর জ্ঞানকর্মসমৃদ্ধ জীবনে কতখানি করতে পেরেছেন, হয়তো এ প্রশ্নই শুধু আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক। যে নূতন বাংলার গোড়াপত্তন রামমোহন আরম্ভ করেছিলেন এবং যে চিন্ময় বাংলার পূর্ণাঙ্গরূপ আজও কুহেলিকা-আবৃত, অথচ যে বাংলা ইতিহাসের ধারাপথে, অলক্ষ্যে সৃজন হচ্ছে—সেই বাংলার ক্রমবিকাশে বিদ্যাসাগরের দান কতটুকু, ইতিহাসের রায় বিদ্যাসাগরের স্বপক্ষে না বিপক্ষে গেছে, এ সব প্রশ্ন আজ সঙ্গতভাবেই এসেছে। আজ যদি বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হতেন, তাহলে তাঁর চিত্তলোকে কোন্ কোন্ সমস্যা মুখ্যরূপ নিত, কোন্ কর্মযোগে তিনি আকৃষ্ট হতেন, এ কল্পনা হৃদয়গ্রাহী তো নিশ্চয়ই, হয়তো একেবারে নিরর্থকও নয়। বিদ্যাসাগরের যুগের সমস্যা—সমাজসংস্কারের ও শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলন আজও পূর্ণতা লাভ করে নি। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে, আজও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিষ্পন্ন হয় নি। এ দৃশ্য দেখে বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই যুগপৎ পুলকিত ও ব্যথিত হতেন। পুলকিত হতেন একথা ভেবে যে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের যে শুভকর্ম তিনি আরম্ভ করেছিলেন, সেই কর্মযোগ জাতির মানসলোকে স্থান পেয়েছে। ব্যথিত হতেন অসমাপ্ত কর্মের কথা ভেবে। অবশ্য যে পার্থক্য বিদ্যাসাগরের সন্ধানী দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ত, সে পার্থক্য এরূপ। আজ সামাজিক মুক্তি-আন্দোলন অনেকাংশে রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত। এবং এই মুক্তি-আন্দোলনে আজ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী অংশীদার—শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা নন। বিদ্যাসাগরের যুগে, ঐতিহাসিক কারণে, নূতন জ্ঞানকর্মযোগের নেতৃত্ব ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হাতে। আজ অন্যান্য নেপথ্যচারী শ্রেণীও ইতিহাসের প্রাঙ্গণে আবির্ভূত। যে জ্ঞানকর্মযোগে, উনিশ শতকে, এঁদের যোগাযোগ ছিল যৎসামান্য, আজ সেই জ্ঞানকর্মযোগে এ সব শ্রেণীর ভূমিকা ক্রমবর্ধমান।

"বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" প্রধানতঃ উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস। বিদ্যাসাগরের জীবনকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থ রচনার হেতু এই যে, এত বিচিত্র ও বিরোধী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উনিশ শতকের আর কোনো বাঙালীর জীবন ও চরিত্র গড়ে ওঠে নি। এবং উনিশ শতকের মধ্যাহ্নকাল বিদ্যাসাগরের জীবনেরও মধ্যাহ্নকাল। বাংলার রেনেসাঁস-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে বিদ্যাসাগরের স্থান। তার মধ্যগগনে তিনি দীপ্যমান। অর্থাৎ বাংলার রেনেসাঁস-এর ইতিহাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবন ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। এবং সেজন্য বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করতে গেলে রেনেসাঁস যুগধর্মের সঙ্গে পরিচয় বোধ হয় অত্যাবশ্যক।

একথা সত্য যে কোনো জাতির জীবনে রেনেসাঁস বিভিন্নযুগে নূতনভাবে হয়তো দেখা দেয়। এবং একযুগ যেহেতু অন্যযুগ থেকে রীতিমত ভিন্ন, তাই সব দেশেরই, সেই-সেই যুগের কালগত বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। ফলে, কোন্ যুগের 'রেনেসাঁস', কি তার বিলক্ষণতা এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশেও রেনেসাঁস বিভিন্ন যুগে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু উনিশ শতকী রেনেসাঁসের বিলক্ষণতা এতই স্বপ্রকাশ, যে অন্য যুগের সাধনার সঙ্গে একে অভিন্ন মনে করবার কোনো ঐতিহাসিক হেতু নেই।

কোনো কোনো আধুনিক সমালোচক অবশ্য উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসকে 'হিন্দু ভাগ্যবন্তদের খণ্ডিত, দ্বিধাগ্রস্ত আত্মসচেতনতা,' 'সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় নেহাত-ই সীমাবদ্ধ', 'দ্বিধাগ্রস্ত ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলন', 'সমাজ-জীবন বিচ্ছিন্ন পরগাছা বাবুদের নিজেদের অস্তিত্বের অলীক মোহ তৈরী', ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে নিপুণ-ভঙ্গিতে খোঁটা দিয়ে থাকেন। এঁদের মতে, 'রেনেসাঁস' শুধুই ইউরোপ নামে এক বিশেষ দেশের, এক বিশেষ যুগের (১৫।১৬ শতক) বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেনেসাঁসী যুগ কোনো কালেই আসেনি, আসা সম্ভবও ছিল না। 'রেনেসাঁস' আলোচনার মূল প্রশ্নই হল, রেনেসাঁস কাদের জন্য? কারা রেনেসাঁস আনলেন?

সমালোচকেরা তাই বলেন, দেশের মৌল চরিত্রের পরিবর্তন ছাড়া রেনেসাঁস নেহাত-ই বাবু-বিলাস, অন্য কিছু নয়। এবং বাংলাদেশে এই বাবুবিলাসী রেনেসাঁসী-প্রেতেরই সাক্ষাৎ মেলে উনিশ শতকে।

প্রবন্ধকারের মতে, 'রেনেসাঁস' শব্দটির দেশগত ও কালগত তাৎপর্য এত সুগভীর, যে, ইউরোপ বহির্ভূত দেশের নবজাগরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথম থেকে,

নূতন পরিভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়ই হত। বাংলার উনিশ শতকের 'রেনেসাঁস', ইতালী তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সঙ্গে অভিন্ন নয়, বরং আকৃতি ও প্রকৃতির দিক থেকে বহুলাংশে ভিন্ন, যেমন কেলটিক-জাতির রেনেসাঁস ইতালীয় রেনেসাঁস থেকে ভিন্ন।

'রেনেসাঁস' শব্দটি বর্জন না করেও শ্রীঅরবিন্দ ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন :

"The word (Renaissance) carries the mind back to the turning point of European culture to which it was first applied; that was not so much a reawakening as an overturn and reversal, a seizure of Christianised, Tutonised, feudalised Europe by the old Graeco-Latin spirit and form with all the complex and momentous results which came from it. That is certainly not a type of renaissance that is at all possible in India." (The Renaissance of India—পৃ ২।৩)।

ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের ভিন্নতা ও বিলক্ষণতা ঐতিহাসিকভাবে অনুশীলনযোগ্য। কিন্তু অধুনা ইউরোপীয় ইতিহাসের নাম নিয়ে বাংলার রেনেসাঁস-এর রিক্ততা উদ্‌ঘাটনে যেহেতু অনেকেই ব্রতী, সেইজন্য রেনেসাঁস প্রসঙ্গে কয়েকটি জিজ্ঞাসা উত্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। Michelet, Burckhardt থেকে শুরু করে আধুনিককালে Russell পর্যন্ত বিদেশী মহাপণ্ডিতেরা রেনেসাঁসের স্বরূপলক্ষণ, সীমা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই চিন্তার ও আলোচনার কয়েকটি সিদ্ধান্ত অনুধাবনযোগ্য।

রেনেসাঁস (Renaissance) শব্দটির আভিধানিক অর্থ—পুনর্জন্ম (ল্যাটিন, re+nasci, to be born)। তবে, ঐতিহাসিকেরা বিভিন্ন যুগের চিত্ত-জাগরণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইতালী ও ইউরোপে যে চিত্তমুক্তির পালা শুরু হয়েছিল, সেই চিত্তমুক্তিকে বোঝাবার জন্য 'রেনেসাঁস' শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। Michelet শব্দটি চয়ন করেন এবং Burckhardt (১৮৬০) শব্দটিকে ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা দেন। Burckhardt-এর মতে (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (খ) ক্রপদী অতীতের আবিষ্কার (গ) জগৎ ও ব্যক্তিমানুষের আবিষ্কার—রেনেসাঁসের এই হল ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্য হেতু রেনেসাঁস-যুগ মধ্যযুগ (Middle Age) থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত। অবশ্য Burckhardt-এর সময় থেকেই রেনেসাঁস-এর অর্থ, তাৎপর্য, যুগসীমা এমনকি রেনেসাঁসের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা, প্রতি-আলোচনা চলে এসেছে এবং এই আলোচনা, প্রতি-আলোচনা অহেতুকও নয়। সংস্কৃতির কোন্ রাজ্যে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে, রেনেসাঁস আন্দোলনে কোন্ দেশের অবদান কতটুকু, এসব প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত সমগ্র রেনেসাঁস-যুগের ভাগ্যই স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। এবং অনেকেই আজ মনে করেন যে রেনেসাঁসের মতো বিচিত্র-জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কোনো এক সহজ, অমূর্ত সংজ্ঞায় বেঁধে দেওয়া অসঙ্গত। তাছাড়া, এ রকম সংজ্ঞা দেওয়াও হয়তো অসম্ভব।

ইতিহাস-অনুশীলনের ফলে দেখা গেছে যে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ শুধুই Dark Age নয় এবং মধ্যযুগের সঙ্গে রেনেসাঁস যুগের স্বাভাবিক পারম্পর্য আছে। আগে যেমন ভাবা হত যে রেনেসাঁস যুগের সমস্ত কিছুই মহৎ এবং উদার, আধুনিক পণ্ডিতেরা সেই অবাস্তব ভাবনা ক্রমশই পরিহার করে আশ্বস্ত হচ্ছেন। কি বিজ্ঞানের দিক থেকে, কি চিত্তমুক্তির প্রশ্নে, ইতালীর রেনেসাঁসও যে বহুলাংশে খণ্ডিত, এ সত্য আজ পাশ্চাত্ত্যের ভাবুকেরা অনেকেই স্বীকার করেন। নীতির মানদণ্ডে, কিংবা জনসাধারণের অংশ গ্রহণের দিক থেকে বিচারে, ইতালীর রেনেসাঁসও নিরঙ্কু মহত্ব দাবি করতে অক্ষম। Russell তো "ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস"-এ বলছেনই :

(1) "The Renaissance was not a popular movement; it was a movement of a small number of scholars and artists encouraged by liberal patrons, especially the Medici and the humanist popes.

(2) Italians of the Renaissance, with the exception of Leonardo and a few others—had not that respect for science which has characterised most important innovators since the Seventeenth Century; with this lack is associated their very partial emancipation from superstition, especially astrology.

(3) The Renaissance was not a period of great achievement in philosophy but it did certain things which were essential preliminaries to the greatness of the Seventeenth Century" ইত্যাদি।

এ-সব সীমা ও স্ববিরোধ সত্বেও, ইতালীয় (তথা ইউরোপীয়) রেনেসাঁস-এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে পণ্ডিত-সম্মতি আছে সেগুলি পুনরুল্লেখযোগ্য। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ :

১। মানুষের মূল্য ও মানুষের শ্রদ্ধেয়তায় আস্থা।

২। মধ্যযুগীয় কতকগুলি মানদণ্ড ও সে-যুগে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্জন।

৩। নবাবিষ্কৃত বিশেষ কতকগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের স্বীকৃতি।

৪। দার্শনিক মতামত প্রকাশের জন্য নূতন সাহিত্যরীতি ও নূতন রচনাশৈলীর প্রচলন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-আন্দোলনের বহু সম্প্রদায় আছে এবং এদের ঐতিহ্য সর্বাংশে এক ধরনেরও নয়। রেনেসাঁস একটি সামান্য, যা অনেক বিশিষ্ট ধারায় অনুগত। রেনেসাঁস অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ধারা এস্থলে উল্লেখযোগ্য— মানবপ্রেম (humanism), দুঃখবাদ (pessimism), সংশয়বাদ (scepticism), প্রাকৃতিক দর্শন (natural philosophy), আরিস্ততলীয় মতবাদ (Aristotlianism), প্লেটোবাদ (Platonism) ইত্যাদি। অর্থাৎ রেনেসাঁস-প্রবাহের শাখা, উপশাখা বিচিত্র এবং এই বিচিত্রতার রসে সিঞ্চিত সাংস্কৃতিক (ব্যাপক অর্থে) আন্দোলনই "রেনেসাঁস"।

ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করেছেন এবং বলছেন যে, উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে একটা বিশেষ যুগ। বাংলাদেশে নূতন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই যুগে। এই রেনেসাঁস-আন্দোলনের পর্ব আছে, পর্যায় আছে, ওঠা-নামা আছে, আছে জোয়ারের অতিবেগ এবং পরবর্তীকালের ভাঁটার ঘোলাটে ক্ষীণধারা। এ আন্দোলনের সীমা ও স্ববিরোধও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তবুও, উনিশ শতকেই বাংলার রেনেসাঁসের উন্মেষ, জ্ঞানে, কর্মে, সামাজিক, শিক্ষা ও সাহিত্যিক আন্দোলনে।

আমরা একথা জানি যে ভারতবর্ষে, মধ্যযুগে (১৩০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দু রেনেসাঁস আরম্ভ হয়েছিল। কে এম পানিক্কর বলেছেন :

"In the sphere of religion and moral thinking, in law, in literature and even in political ideas, a new life came into

being in India by the middle of the 16th century, which was justly be termed the first Indian Renaissance." রাজনীতি, আঞ্চলিক সাহিত্য ও চৈতন্য, রামানন্দ, কবীর, নামদেব, বল্লভাচার্য ও নরসিংহ মেহতা প্রভৃতি সাধকভক্তদের ভূমিকা আলোচনা করে শ্রীপানিক্কর দেখাচ্ছেন, এ যুগে হিন্দুমানসের অভিনব রূপান্তর ঘটেছিল। সংস্কৃতের প্রাধান্য বজায় থাকলেও, এ যুগে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। মিথিলায় বিদ্যাপতি, বাংলায় চণ্ডীদাস, কবীর, মীরা, নাথস্বামী এবং আরও অনেকে, নূতন সাহিত্যের পত্তন করেছেন। শ্রীপানিক্করের ইতিহাস আলোচনা যে অর্বাচীনের ছেলেমানুষী নয় এবং সত্যই যে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টিশীল চিন্তা ও ভাবপ্রবাহের ধারা দেশের মানসলোক উদ্ভাসিত করেছিল, ইতিহাসের ছাত্রের এ কথা জানাই আছে।

তবুও, উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে এই প্রথম রেনেসাঁসের তুলনা চলে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন :

ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে। উনিশ শতকে, ইংরেজ আমলে চিত্তের জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই ; এবং রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের বাঙালী প্রধানদের সঙ্গে যখন প্রথম ইংরেজী সাহিত্যের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে তাঁরা অভিনব রস আহরণ করেছেন তা নয়। তাঁরা পেয়েছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ ; শুনতে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা। তাঁদের কাছে এই ভাবজগৎ ছিল নূতন, কিন্তু বাস্তব। সেদিনকার যুগনায়কদের চেতনায় ইউরোপের সংস্রব একদিকে এনেছিল বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা, আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে খণ্ডিত হতে পারে না।

আমাদের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রাণের, চিন্তার ও মননের যে চেষ্টা

সঞ্চারিত হয়েছিল, সেই চেষ্টাই অঙ্কুরিত হতে থাকে উনিশ শতকে। সেই অঙ্কুর শাখাপল্লব বিস্তার করেছে, বিকশিত হয়েছে, কোনো শাখা হয়তো জরাজীর্ণ হয়ে স্খলিত হয়েছে, তবুও, সমগ্রভাবে দেখলে বলতে হয় যে, বিকাশের ধারা সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত না হলেও, আজও অব্যাহত, যদিচ সেই ধারা আজও পূর্ণতালাভ করে নি।

যদিও মানবতাধর্ম বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সাধনা, তবুও উনিশ শতকে এক বিশেষ অর্থে আধুনিক চেতনার প্রতিষ্ঠা, অবিমিশ্র মানবিকতাবোধে। বিদ্যাসাগরের জীবনে ও মননে এই মানবতাবোধ তাঁকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তোলে নি। অনাধুনিক যুগের চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং ঐ যুগের মানবিক উপাদানকে বর্জন তিনি করেন নি। অথচ আধুনিক মানসের আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা প্রভৃতিও তাঁর মহনীয় জীবনকে চিহ্নিত করেছে।

"বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ"-এর লেখক বিশ্বাস করেন যে বাংলার রেনেসাঁস ও ইউরোপীয় রেনেসাঁস গতিপ্রকৃতির দিক থেকে—আন্তরধর্মের দিক থেকে, প্রায় অভিন্ন। "তুলনামূলক পদ্ধতিকে" আশ্রয় করে গ্রন্থকার বাংলায় রেনেসাঁসের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের জীবন-আলেখ্য অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় ইউরোপীয় নজীরের উল্লেখ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে বাংলার রেনেসাঁসের সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। গ্রন্থকার বিবিধ তথ্য আহরণ করে দেখিয়েছেন :

১। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিন্যাসে ভাঙন ধরেছিল এবং এ-যুগে বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতার বাঙালী সমাজে এই অস্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের যে কোনো জের ছিল না তা নয়।

২। ১৯ শতকের প্রথম পাদে কলকাতা শহরে, বাঙালী সমাজে নূতন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল। এই ভদ্রলোকেরা চাকুরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং এবং এঁরা ছিলেন 'বিত্তবান' ও 'ভদ্রলোক' —দুই-ই। এই ভদ্রলোকদের আবির্ভাবে এক নূতন সমাজবিন্যাস সৃষ্টি হল, যে সমাজবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না। এ যুগে শ্রেণীমর্যাদা বিত্তগত হল, পূর্বে ছিল কুলগত বা বংশগত। নবযুগের শ্রেণীমর্যাদা যখন বিত্তগত হল, তখন বাংলাদেশের শ্রেণীবিন্যাসের ধারারও পরিবর্তন হল।

৩। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে, নবযুগের নতুন শিক্ষাসংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠছিল। এই যুগপর্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ডিরোজিওর শিক্ষকতায় 'ইয়ং বেঙ্গল' দল নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। রামমোহন বাংলাভাষায় প্রথম বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বিচারবিতর্কও আরম্ভ করেছেন পূর্ণোদ্যমে। পটলডাঙ্গার কলেজ গৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন-লক-হিউমের জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভা বসছে। সব মিলিয়ে বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে ও মানসলোকে তখন আলোড়নের আভাস। তাছাড়া, বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে (ক) অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন, (খ) জ্ঞানসন্দীপন সভা, (গ) সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা, (ঘ) সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, (ঙ) তত্ত্ববোধিনী সভা ও আরও অন্যান্য সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচনা হত। এবং নবযুগের সামাজিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হল এই সভাসমিতিগুলি।

৪। এ-যুগপর্বে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা। অবশ্য এই প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতার জীবনে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিলাস-ব্যভিচার প্রকট হচ্ছিল। অন্যদিকে বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য মানুষের— কৃষকের ও কারিগরের অবস্থা দুর্দশার চরমে উঠছিল। কাজেই কলকাতায় নবযুগের, নবজাগরণের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনের শোকসঙ্গীতের বিষাদের সুরের মধ্যে তার মাদকতা আপামর সাধারণের কাছে পৌছয় নি।

৫। গ্রামীণ জীবনে ভাঙন, দুর্দশার ঘনকৃষ্ণ মেঘ, অন্ধকারের কালো রেখা। তথাপি এ-যুগের জীবনমন্ত্র হল মানবমর্যাদাবোধ, অন্যায়, অযুক্তি, কুযুক্তি ও যুক্তিহীন মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। এই মনোভাব গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় নি, জনজীবনে এর প্রভাব সে-যুগে ছিল যৎসামান্য। তবুও সমাজ সংস্কারের চেতনা এ যুগে ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজে প্রবল হয়েছে, যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা বেড়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, স্বাধীন আলোচনা

ইত্যাদি নূতন চেতনা ও মূল্যবোধকে প্রকাশ করেছে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের সূচনায় এই সংস্কারোন্মুখ সামাজিক পরিবেশ, মধ্যবিত্তসমাজে স্পন্দিত নূতন প্রাণশক্তির বন্যা—তাঁর জীবন ও চরিত্রকে বহুল পরিমাণে রূপায়িত করেছে।

৬। পরবর্তী পর্বে, কর্মজীবনে, সমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে গ্রন্থকার অধ্যবসায়ের সঙ্গে ও অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিদ্যাসাগরের "শিক্ষাচিন্তা," "বাংলাশিক্ষা," "স্ত্রীশিক্ষা," "সমাজ সংস্কার" প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও সংগ্রামের কাহিনী আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ১৮৫০ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম দশবছর বিদ্যাসাগর ছিলেন নতুন সামাজিক আন্দোলনের কর্ণধার। সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয়। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে বাংলা সাংবাদিকতাকে ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বিদ্যাসাগর বৃহত্তর ও মহত্তর সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ করে তুলেছিলেন। এই কারণে তাঁকে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক বলা যায়।

যে পরিবেশে বিদ্যাসাগরের চৈতন্যের ও কর্মের ফসল ফলেছিল, গ্রন্থকার সেই পরিবেশকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। পরিবেশ ও তৎকালীন সমাজ যে ব্যক্তিচরিত্র নানাভাবে প্রভাবিত করে এ তত্ত্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের ঔৎসুক্য সর্বত্র পরিস্ফুট। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিনবত্বও যে উপেক্ষণীয় নয়, একথাও গ্রন্থকার স্মরণ রেখেছেন। কোন্ মনস্তাত্ত্বিক জমিতে চিন্তাভাবনার ফসল ফলেছে, এ প্রশ্নও গ্রন্থকার উত্থাপন করেছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের দেশীয় ও কুলগত চারিত্রিক ঐতিহ্যের প্রশ্নও স্বভাবতই গ্রন্থকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যা কিছু মহৎ এবং নূতন, নাগরিকসমাজের যা কিছু গতিশীল, তাই, বিদ্যাসাগর আপন প্রজ্ঞাবলে সাদরে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। অন্যদিকে, দেশীয় ও কুলগত বিভিন্ন গুণাবলী যথা—প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, বিনয়, আচার এবং অহংবোধ, এই চরিত্রের উপাদান।

ইতিহাসের বিচারে বিদ্যাসাগরের চরিত্র ও কর্মকীর্তির গুরুত্ব কতখানি? বিদ্যাসাগরের চরিত্র কি সব রকমের সীমা ও স্ববিরোধ থেকে মুক্ত ছিল?

গ্রন্থকার দেখাচ্ছেন যে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও সমুন্নত হলেও তার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর সংস্কার-চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধের দোষও ছিল। "সীমা ও স্ববিরোধ" পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এই স্ববিরোধের লক্ষণ ও হেতুনির্ণয় করতে চেয়েছেন।

তথাপি বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের অদ্বিতীয় পুরুষ। প্রাচীন ঋষিদের মতন জ্ঞান ও ইংরেজের মতন কর্মশক্তি তো বিদ্যাসাগরের ছিলই, তদুপরি তাঁর চরিত্রে যুগদুর্লভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলার রেনেসাঁসের এই সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ বিদ্যাসাগর চরিত্রে হয়েছিল। ফলে তিনি বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন।

শুধু ব্যক্তিগত চারিত্রমর্যাদার দিক থেকেই নয়; উপরন্তু কিছু কিছু অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর ইতিহাসের গতিমুখেই চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন হয়েছিল। সেইখানের তাঁর ঐতিহাসিক সার্থকতা।

'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নানাদিক থেকেই উপাদেয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার সমাজবিজ্ঞানের আলোকে উনিশ শতকের বাংলাসমাজকে বুঝতে চেয়েছেন। সামাজিক শক্তি ব্যক্তিজীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যাসাগরের জীবনে তৎকালীন সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কতখানি প্রভাব রেখেছে, এবং বিদ্যাসাগর সমাজকে কতটা প্রভাবিত করেছেন, এই দ্বৈতশক্তির গতি-প্রকৃতির অনুশীলন গ্রন্থকারের মূল উপজীব্য। এতৎসত্ত্বেও, গ্রন্থকারের মূল উপাত্ত সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

বাংলার রেনেসাঁস-এর গতিপ্রকৃতি আলোচনায় আজও দুটি একদেশদর্শী প্রবণতা লক্ষণীয়। একদিকে আছে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা, যে প্রবণতার ফলে অনেক সমালোচক 'রেনেসাঁস' প্রত্যয়টি বর্জন করতে উন্মুখ। যথা, "It was this class of proprietors, enriched by the plunder of millions of poor peasants, who brought about a cultural resurgence in the city. This resurgence has often been mistakenly called the Indian Renaissance......"

"The renaissance was, characteristically enough brought

to fruition by an alliance with the ruling power by a class of absentee landlords and Banians aspiring to be 'junior partners' away from the village."

"The country at large did not exist for this renaissance." (Census of India, Vol. 6, pp. 442). অন্যদিকে আছে যান্ত্রিক অনুকৃতির প্রবণতা, যে প্রবণতার ফলে অনেক পণ্ডিত দেশকালের বিভিন্নতা উপেক্ষা করে বাংলার রেনেসাঁসে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সব লক্ষণ আবিষ্কারে উদ্যোগী। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজের লেখকের এই দ্বিতীয় প্রবণতা সুস্পষ্ট। ফলে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে ফ্লোরেন্স যদি আধুনিক ইউরোপের 'প্রোটোটাইপ' হয়, তাহলে নবযুগের কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে।

গ্রন্থকার স্বীকার করছেন যে, ইউরোপের 'বুর্জোয়াশ্রেণী' কিংবা 'ক্যাপিটালিস্ট' শ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। ফলে, নবযুগের আদর্শের ধারক ও বাহক বাংলাদেশে শিল্পবিপ্লব-সঞ্জাত 'নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত' নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে বাংলাদেশে নতুন এক জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তাঁদের বংশধরেরাই আধুনিক বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। বাকি অংশ বিদ্যাবুদ্ধিজীবী ও চাকুরিজীবী।

ইউরোপীয় নাগরিক মধ্যবিত্তের সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্তের মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেও, গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করেছেন—নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীই রেনেসাঁস প্রভৃতির উদ্যোক্তা। এ সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক তথ্যসঞ্চয়ন প্রয়োজন, মনে হয় গ্রন্থকার সে প্রয়োজন স্বীকার করেন নি। বাংলার সমাজেতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের সাদৃশ্যই শুধু খুঁজেছেন, দেশগত কালগত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন নি। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার যদি ভারতীয় তথা বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের অভিনবত্ব স্মরণ রেখে অগ্রসর হতেন, তাহলে বোধ হয় বাংলাদেশের রেনেসাঁস গবেষকেরা আরও উপকৃত হতেন। অধ্যাপক ডি. ডি. কোশাম্বী (ভারতীয় ইতিহাস-পাঠের ভূমিকা, পৃ ৩৭০) বলছেন:

"The considerable hiatus caused by the British conquest in the steady development of the Indian bourgeoisie has to be taken into account. It was not the merchant princes, financiers, monopolists of the late feudal period who turned into the new Indian bourgeois. They were neatly cleaned out as soon as the feudal governors in whose shadow they had carried out their lucrative practices were supplanted by the British."

"The new class that rose in the second-half of the 19th century……developed out of the go-between dalals who were ultimately based on machine production, but production mostly in England, supplied by India with raw materials and a market."

প্রশ্ন হবে কেন এমন হল? অধ্যাপক কোশাম্বী বলেছেন:

"The Indian pre-capitalist accumulation could not give rise immediately to mechanisation nor to an advanced proletariat as had the British in England. Machines, technique and the first technicians had to be imported.

This accounts for India's backwardness……".

গ্রন্থকার বাংলার নবজাগরণের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব এবং স্ববিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত। বৈদেশিক শাসনাধীনে এই জাগরণের বাস্তব ভিত্তি অনেকটাই যে রচিত হয় নি, এ সত্য স্থানে স্থানে তিনি স্বীকারও করেছেন। কিন্তু তবুও পাঠক অনুভব করেন যে গ্রন্থকার এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে অল্পাধিক কুণ্ঠিত।

বাংলার রেনেসাঁস-সংস্কৃতি যে পুরাতন সংস্কৃতির শুধু ক্রমবিকাশ নয়, কৃষিপ্রধান পল্লীসংস্কৃতির সঙ্গে এর বিচ্ছেদ যে আত্যন্তিক, বহুলাংশে এ সংস্কৃতি যে শিক্ষিত, হিন্দু মধ্যবিত্তের (ইউরোপীয় middle class নয়) মানস সম্পদ এবং এ সংস্কৃতি যে মনোজগতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রন্থকার এইসব প্রতিজ্ঞা হয়তো গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় এগুলি যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে নি।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলার রেনেসাঁস-প্রেরণা আন্তরিক, যদিও এই প্রেরণার মূলে মাটি নেই। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে, সীমা ও স্ববিরোধ-সহ, রেনেসাঁস-যুগের অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। এই ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের সাধনা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবার দাবি রাখে।

বর্ষার জানলায়

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কাঠকয়লায় লেখা নাম
বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে, মেঘগুলো পালাচ্ছে।

জানলার জনান্তিকে
অবিরাম বৃষ্টির কাটাকুটি, আর
ঝাপ্সা হাওয়ায় অস্পষ্ট দেহাতি গন্ধ।

হাঁটুতে মুখ-গোঁজা দিন
অন্ধকারের দাওয়ায় গোঁজ হয়ে বসে ;
কাঁঠালবিচি পোড়ার গন্ধে
ঠাকুরমার ঝুলি থেকে গল্প বেরুলে
এখুনি সে গোগ্রাসে গিলবে।

এখন দীর্ঘশ্বাস
আকালের দাওয়ায় নড়েচড়ে বসছে।
আর জানলার জনান্তিকে ঠায় বসে
গালে হাত-দেওয়া অন্ধকার।

অনেক দূরে দাঁড়িয়ে নিরীহ আকাশটা
সারাক্ষণ ভিজছে।
কাঠকয়লায় লেখা নাম বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে
মেঘগুলো, মেঘের আড়ালে পালাচ্ছে।
বর্ষার হিজিবিজি জানলায়
অবিরাম বৃষ্টির কাটাকুটি ॥

বাণিজ্যযাত্রা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ণিজ্য দূরের যাত্রা ; এই পথে বাল্য যায় কৈশোরের বেলা।
াবার ঢাকের শব্দ, মহাজনী নৌকা লাগে ঘাটে ;
াকাশে নবীন মেঘ ডাক দেয়, কোথা পরবাসী
কে কোথায় দ্বিধা কর বেলা হলে সূর্য যাবে পাটে।

-যাত্রা কি নিয়ে ফিরি ; বল বুকে কি তৃষ্ণা রেখেছ :
রঙ্গ ? উতলা দৃশ্য ? কিম্বা নীল স্থির ঠাণ্ডা জলে
ন্তচ্যুত কোনো ফল—রক্তিম সুপক্ব সূর্য,
াল রঙ খুঁটে খায় মাছ।
েই মনোহর ফল ?—চিরবন্ধ্যা দু-সতীনে ভাগ নিয়ে কি কলহ,
িন গেলে চতুর্দশী রাত্রে তারা দুই সখি দুই চোখে সুখের পূর্ণিমা
র কোলে জলে চাঁদ, ওর কোলে ভাসে চাঁদ, আকাশে ধরে না!

য়তো এ-সব কথা ভুলে যাব, তুমি দেখবে সাদা পাল ফিরে এল হাওয়ায় একাকী
ক সুন্দরী পাটাতনে বসে আছে, বুঝি বিভা, মুক্তকেশ অপর চেতনা।
াক, তিক্ত চিন্তা থাক! মনে পড়ে বাল্যকাল যাত্রার আসরে সেই গান :
-ভবে কেবল মেলা, এ-বেলার পুতুল ওবেলা
ভেঙ্গে যায়, দুঃখ ছাড় যৌবন বয়সে কেউ কণ্টকে কাঁদে না।

াল্য, তুমি পিছে আছ, সঙ্গে আজো যাত্রার বিবেক।

একটি কবিতা

উৎপলকুমার বসু

জানি অন্ধকার তুমি বহুদূর যেতে পার—জানি নীরবতা তুমি
যতদূরে যাও সেই পথের দুপাশ ছুঁয়ে মৃত বা অমৃত
কল্প গাছের সারি—ভোল মৃত্যু খোল মায়াজাল
শূন্যে বাতাস জুড়ে আমি এক প্রবাসী কঙ্কাল শুয়ে আছি।

তবে কি তোমার রথ অস্তগোধূলিপারে ডুবে গেল ?
তবে কি তোমার রথে ঘূর্ণমান পশ্চিমসূর্যের গতি ম্লান দেখে দেখে
আমি আরেক দিগন্ত পারে হাজার স্ফুলিঙ্গে গড়া জ্যোৎস্না পেয়ে যাব ?
এ মৃত্যু সেখানে শেষ। এই মায়া অনৃত সেখানে।
কল্পগাছের সারি ততদূর ফিরে যায়। ততদূরে তুমি যাও
নীরবতা। তুমি ডাক সমস্ত পথিকে—যেন রুদ্র অন্ধকার

সমুদ্ররেখার তীরে নিয়ে গেল লক্ষ উল্কাপাতে
যা কিছু শ্রমের দান, এই দেশ, রাজ্য যেন, সংসার,
অগণ্য রাজার দল, সভাসদ, লুণ্ঠিত শত নাগরিক
সমস্ত নীরব হ'লে প্রাচীন ঘণ্টার মত 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' শোনা গেল।

আরোগ্যের পর : স্যানাটরিয়মের স্মৃতি

গোবিন্দ গোস্বামী

কখন সে রক্তমুখ উত্তরণে নিঃশব্দ ক্রন্দন
বিস্তৃত আকাশ জুড়ে পশ্চিমের শেষ পরিচ্ছেদে
সূর্যরশ্মি চিত্রায়িত ক্ষতপট আহত জীবন
নিয়ে মৃদু কানাকানি করে অনতিদূরের এক হ্রদে।

এখানে এলাম কবে, শূন্য চোখে বিক্ষত হৃদয়
যতদূর চেয়ে থাকে, ছাখে—এক নির্জন নিবিড়
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জুড়ে সমুদ্রের ঢেউ বিনিময়,
দৃশ্যান্তের পটভূমি, ছায়া, এ বাতাস আশ্চর্য গভীর !

নিঃসঙ্গ ঘাসের গন্ধ সূর্যশুভ্র শিশিরের স্তবে
এ রুগ্ন জীবন চলে পায়ে পায়ে গতি নিয়ে পথে
যেখানে অসংখ্য চোখে নগরীর জীবন্ত উৎসবে
রেখে যায় আলো-দেহ, দেয়ালির নীলাভ জগতে।

ফিরে এসে চলে যাই, কী আশ্চর্য এই দিন গোনা
কত অশ্রু, কত রক্ত কার স্বাদ সবচেয়ে লোনা ?

শিকার

মলয় বসু

নিমুদা সাইকেলটা নিয়ে পাকা রাস্তা থেকে বাঁদিকের ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়লেন। বাঁদিকে দিগন্তবিস্তারী ধানের ক্ষেত। চলতে শুরু করলেন আলের উপর দিয়ে। বাঁ কাঁধে একটা ছিপ, ডানহাতে ধরা সাইকেল।

একটু পিছনে আরেকটি সাইকেল থেকে নামল মতি আর খোকা। দুজনের মুখে তখনও হাসি। কি একটা প্রসঙ্গে দুজনের হাসি এসেছিল এখনও রেশ যায় নি। একজনের বয়স বাইশ, আরেকজনের একুশ। দুজনের পরনে ফুলপ্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট, পায়ে স্যাণ্ডাল।

নিমুদা অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

সাইকেল থেকে নেমে খোকা দু কোমরে হাত রেখে বুকটা টানটান করল। মুখটা বিকৃত করল।

বলল, উঃ, শ্যালা ডান পা-টা চিনচিন করছে—কি সাইকেলরে বাবা—এতদূর রাস্তা—

মতি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। সাইকেলটাকে কোমরের পেছন দিক দিয়ে আটকে রেখেছে। বাঁ হাতে লম্বা লম্বা দুটো ছিপ। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো একটা কালো রঙের থলে। মাছের টোপ। কাঁধে ঝোলানো একটা ফ্লাস্ক। চা—

মতি বলে, নে নে এতক্ষণে তো সিনেমা হলে বসে মেমদের চেহারা দেখে পয়সা দিতিস। নিয়ে আসলাম ভালো জায়গায়—এতদূর রাস্তা প্যাটেল করে—নে ছিপ দুটো ধর—

—এই মতি, বিড়ি এনেছিস তো—ছিপ দুটো মতির হাত থেকে নিতে নিতে খোকা বলে।

—এনেছি কিন্তু সাবধানে খাবি—নিমুদা আছেন।

—ও অনেক দূরে। দে—

মতি বিড়ি আর দেশলাই বের করে খোকার হাতে দেয়। খোকা ফস করে দেশলাই ধরায়। বলে, কিরে তুই ধরাবি না?

—না, পরে। মতি উত্তর করে।

খোকা একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। সামনের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের দিকে একবার তাকায়। তারপর ছিপ দুটো হাতে নিয়ে ঢালু জমিটার উপর দিয়ে তরতর করে নেমে একদম আলের উপর নিয়ে ওঠে।

কাঁধে ফ্লাস্ক, হাতে সাইকেল নিয়ে মতিও পেছনে পেছনে নেমে আসে। উঁচু থেকে নীচে নামার জন্য সাইকেলটা ঘটাং ঘটাং দু-তিনটে শব্দ করে।

খোকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। রাস্তাটা এখান থেকে অনেকটা উঁচুতে।

দুপাশে ধানক্ষেত।

লালচে রঙ ধরেছে ধানের গাছে। মাথাগুলো নুয়ে পড়েছে শিষের ভারে। গাছে গাছে লেগে শর শর শর করে শব্দ উঠছে। দুপুরের নির্মেঘ আকাশে দুটো চিল মতি আর খোকার আর ধানক্ষেতের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়ছে।

এই শর শর শর শব্দটা খোকা প্রথমে খেয়াল করেনি। যখন করল তখন বিড়িটায় শেষ একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বলল, অ্যাই মতি, এই শব্দটা কিসের রে?

প্রশ্নটা করলেও নজরটা ক্ষেতের দিকে দেখে মতি বলে, যেখানে তাকিয়ে আছিস ঐ ক্ষেতের ভিতর থেকেই উঠছে। গাছে গাছে লাগলে ওরকম শব্দ হয়।

—বাঃ, বেশ নাইস শব্দ তো—শর শর শর, মুখ দিয়ে শব্দ করে খোকা।

হাত বাড়ালেই পাকা ধানের শিষ। খোকা একটা শিষ ছিঁড়ে আনে। শিষ থেকে ধানগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে বাঁ হাতের তালুর উপর রাখে। তারপর একটা তুলে নিয়ে মুখে দেয়।

পরক্ষণেই বলে, কিরে মতি, ভেতরে যে কিছু নেই!

—সব ধানেই কি চাল থাকে নাকিরে? দেখ অন্যটায় আছে, মতির নজর নিমুদার দিকে।

অনেকখানি চলে এসেছে তারা ক্ষেতের ভিতর দিকে। পাকা রাস্তার উপর দিয়ে একটা ট্রাক বিকট শব্দ তুলে চলে যায়। খোকা পেছন ফিরে দেখে।

তারপর বলে, কিরে আর কদ্দুর? ধানক্ষেতেই মাছ ধরবি না কি?

—চল না, এই তো সামনে। দেখবি জায়গাটা খুব সুন্দর। ছোট্ট একটা নদী এসে পড়েছে একটা বিরাট খালে—এখানকার লোকেরা বলে ওটা গদাধর নদী। ঐ সামনের বড কুলগাছটার ঠিক পেছনেই—

খোকা একবার চোখ তুলে জায়গাটাকে বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর আরেকটা ধান মুখে ফেলে। একটা গানের সুর ভাঁজে—হু হু হু উ—হু হু হু উ-উ…

ধানগাছগুলো আলের গা ঘেঁষে। খোকা ডান হাত দিয়ে ধানগাছের শিষগুলোকে হুইয়ে দেয়। কোনোটার শিষকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে।

আকাশ পরিষ্কার।

খোকা উপরের আকাশের দিকে একবার তাকায়। তারপর চারপাশের বুক সমান উঁচু ধানগাছগুলোর দিকে একবার তাকায়।

গানের গুনগুনানি থামে।

তারপর হঠাৎ মতিকে বলে, দেখ মতি, ধানগাছগুলো কত উঁচু—প্রায় বুক সমান—না?

দূরে নিমুদাকে লক্ষ্য করে বলে, দেখ, নিমুদার শুধু মাথাটা আর ছিপটা দেখা যাচ্ছে।

খোকা আর মতির চারপাশে ধানের ক্ষেতটা চক্রাকারে যেন ঘিরে ফেলেছে দুজনকে। খোকা সেটা লক্ষ্য করে।

চারপাশটা একবার দেখে খোকা কি ভেবে যেন বলে ওঠে, মতি, একটা জিনিস দেখবি? ধানক্ষেতটা যেন ঘুরছে আমাদের চারপাশে—গ্যাখ—

মতি এতক্ষণে বিরক্ত হয়। বলে কি আরম্ভ করেছিস বাচ্চা ছেলের মতো—এটা ঘুরছে, সেটা নড়ছে—একটু তাড়াতাড়ি চল। গ্যাখ তো নিমুদা কতটা এগিয়ে গেছেন, বলে মতি খোকার আগে আগে দ্রুতপদে চলতে থাকে।

খোকার তেমন গরজ নেই জোরে হাঁটার। তবুও অপেক্ষাকৃত জোরে পা চালায়।

কিছুটা হাঁটে চুপচাপ।

তারপর বলে, শহর থেকে ক-মাইল হবেরে এ জায়গাটা?—মাইল পাঁচেক তো হবেই। বেশ গ্রাম গ্রাম—লোক নেই, জন নেই।

কে বলল তোকে পাঁচ মাইল? মতি উত্তর দেয় কিন্তু হাঁটা বন্ধ করে না। সাইকেলের চেনে কেমন একটা ক্যার-ক্যার শব্দ হয়।

—তবে ক-মাইল?

—মাইল তিনেক হবে।

—তাই নাকি? আমি তো ভাবলাম কোন অজ পাড়াগাঁয়ে চলে এসেছি।

কলকল শব্দটা দুজনেই পাচ্ছিল কুলগাছটার কাছাকাছি এসে।

মতি বলে, ঐ যে জল পড়ার শব্দ।

—কোথায়?

—এই উঁচু জমিটা ডিঙ্গাতে হবে। খোকা এতক্ষণে যেন কিছু করবার সুযোগ পায়। একবার উঁচু ডাঙ্গা এবং উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার দিকে তাকিয়ে লাফাতে লাফাতে উঁচু জমিটার উপর ওঠে।

মতি সাইকেলটা জমিটার গায়ে হেলান দিয়ে রাখে।

খোকা উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মতির দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলে, অ্যাই মতি, ঠিক ঝরনার মতো জল পড়ছে রে—মতি কথা না বলে উঁচু জমিটার উপর উঠে আসে। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ায়। তারপর খোকাকে বলে, নে এবার নাম।

ছিপ দুটোকে নিয়ে একরকম দৌড়ে নীচে নেমে যায় খোকা। নালার মতো ছোট্ট গদাধর নদীটাও লাফ দিয়ে পার হয় সে।

আবার ওপারে এপারের মতো উঁচু জমি।

খোকা নীচে থেকে চেঁচায়।

মতি তরতর করে নীচে নেমে আসে। দুজনে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। তাদের দুজনের ঠিক সামনে গদাধর নদীর ধারাটা শেষ হয়ে গেছে। তারপর সে জায়গা থেকে হাত সাতেক নীচে বিরাট এক পুকুরের মতো গোল জায়গায় কলকল করে জল পড়ছে।

খোকা একদম ধারে গিয়ে নীচটাকে ভালো করে দেখে।

বলে, দেখছিস মতি, এই খালটার ভিতর থেকে আরেকটা নালা বেরিয়ে সোজা চলে গেছে।

—হুঁ। কিন্তু অত ধারে যাস না। তুই যেখানে দাঁড়িয়েছিস তার নীচটা ফাঁপা—ধ্বসে নীচে পড়ে যাবি।

সেইদিকে একবার তাকিয়ে চার-পা পিছনে সরে আসে খোকা—

মতি ততক্ষণে ছিপের গা থেকে সুতো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পায়ের পাশে ভিজে জমির উপর রাখা কালো রঙের থলেটা—

—নিমুদা কোথায় রে? খোকা চারিদিকে তাকিয়ে বলে।

—ঐ তো ঐ পাথরটার আড়ালে।

নিমুদার হাত আর ছিপটা শুধু দেখা যাচ্ছে। ঐ খালের হাত সাতেক উপরে হাত দুয়েক চওড়া একটা চাতালে উটকো মেরে বসেছেন নিমুদা।

—এর মধ্যে এসে ছিপ ফেলে বসে গেছেন নিমুদা!—মতি কথা শেষ করে।

নিমুদার দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই খোকা মতিকে বলে, দাঁড়া এদিককার উঁচু ডাঙ্গার উপরটা একবার দেখে আসি। বলেই দ্রুতপদে নয় একরকম দৌড়েই উঁচু ডাঙ্গার উপরে গিয়ে উঠল।

এদিকেও তেমনি দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত। খোকা দুচোখ মেলে দেখল। আবার এপাশে ঘুরল। এদিকেও তেমনি ধানক্ষেত—উঁচু ডাঙ্গার উপর কুলগাছটা।

মতি বুঝি একবার খোকার দিকে তাকাল। নিমুদার পিছন দিকটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে—এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত গদাধর নদীটাকে দেখা যায়, খোকা দুই হাত কোমরে রেখে ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করল।

উঁচু ডাঙ্গার গা বেয়ে নামতে নামতেই বলল, আমরা বসব কোথায়?

—এই ডানদিকে আরেকটু এগিয়ে। এই নে ছিপ, টোঁপ গেঁথে দিয়েছি—ফেলে বসে থাক ঝোপটার সামনে।

খোকা ছিপ নিয়ে ঝোপটার পাশে বসে। মতি আরেকটু এগিয়ে একটা পাথরের উপরে বসে।

খোকা ছিপ ফেলে জলে। উঁকি মেরে জলটা দেখে।

—এই খোকা, তোর ছিপের জল বাড়িয়ে দে। নিজের ছিপ জলে ফেলতে ফেলতে মতি বলে।

ছিপটা জল থেকে তুলতে তুলতে খোকা বলে, জল আবার বাড়ায় কেমন করে?

—ফাতনাটা টেনে উপরের দিকে নে—মতি চেঁচিয়ে বলে।

—ফাতনাটা সুতোর উপর দিকে কিছুটা উঠিয়ে খোকা বলে, দ্যাখ তো মতি—বাড়াব?

—না, ঠিক আছে এবার ফেল।

ফত করে একটা শব্দ হয়। নিমুদা একটা মাছ উঠিয়েছেন। ছিপটা জলে ফেলে খোকা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। নিমুদাকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিমুদা দাঁড়িয়েছেন। পরনে ধুতি, গায়ে আধময়লা একটা পাঞ্জাবি। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। নিমুদা মাছটাকে খুলে একটা ছোট সাদা ন্যাকড়ায় মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর টোপ গেঁথে সুতোটা একটু দুলিয়ে ছিপটা ফেললেন।

মতি বলল, পাফদা ধরলেন নিমুদা। কটা হল? কেঁচোর টোপে নিশ্চয়ই?

খোকা ভাবে: কই আমি তো চিনতে পারলাম না কি মাছ ওটা? অথচ এতদূর থেকে মতি ঠিক বুঝেছে, কোন মাছ উঠেছে ছিপে! ব্যাটা আচ্ছা মেছুয়া হয়ে উঠেছে আজকাল।

নিমুদা ছিপটা ফেলে একবার ঝুঁকে পড়ে জলের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন। আকাশটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর খোকার মাথার পেছন দিয়ে উঁচু ডাঙ্গার কুলগাছটার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করলেন।

খোকা দেখে ভাবল, নিমুদা দেখছেনটা কি? নিজেও পিছন ফিরে একবার কুলগাছটাকে দেখল।

নিমুদা বসেছেন। সামনে নিমুদাকে আড়াল-করা বড় পাথরটা। নিমুদার হাত আর ছিপটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

তিনজনে ছিপ ফেলে বসে আছে।

খোকার নজর সাদা সুঁচলো ফাতনার দিকে। জলের স্রোতে একটু একটু নড়ছে। খোকা লক্ষ্য করছে কেমন করে যে জায়গাটায় সে ছিপ ফেলেছিল, ফাতনাটা সে জায়গা থেকে জলের তোড়ে ডানদিকে সরে আসছে।

খোকা ছিপটাকে তুলে আবার আগের জায়গায় ফেলে। নিমুদা ও মতির দিকে একবার তাকায়। তারপর আবার লক্ষ্য করে ফাতনাটা কেমন করে, বোঝা যায় না এমন জলের তোড়ে ক্রমে ক্রমে ডানদিকে সরে আসে।

ঝরনার মতো যেখানে জল পড়ছে সেদিকে তাকায় খোকা। ফেনা উঠছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। জলগুলো ঘুরতে ঘুরতে এগুচ্ছে। খোকা দু হাঁটুর মাঝখানে থুতনিটা চেপে অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

খোকার যেন মনে হয়, তার কোনো কাজ নেই—অস্বস্তিকর ভাবটা যেন দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে। সে যেন স্পষ্ট অনুভব করল তার শরীরের ভেতরে একটা শিরশিরানি চলছে—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা—

ফস্‌স—মতি কি একটা মাছ তুলেছে এবার। মাছটা বঁড়শির মাথায় তখনও নড়ছে।

খোকা দেখে।

—ধ্যাত তেরি—নিমুদা ট্যাংরা দিয়ে বউনি, মাথাটা একটু নেড়ে মতি বলে।

—কিরে, তোরটার খবর কি? খোকার দিকে চেয়ে মতি বলে।

—ধ্যাত! খায় না—ফাতনার দিকে একপলকে একটু দেখে খোকা বিরক্তি মুখে উত্তর করে।

—প্রথম প্রথম অত তাড়াতাড়ি হয় না—অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, মতি বিজ্ঞের মতো উপদেশ দেয়।

—তার চেয়ে সিনেমাটা দেখলেই ভালো হত—কবে মাছ খাবে তার জন্য হাঁ করে বসে থাক—খোকার মেজাজটা যেন আবার খারাপ খারাপ লাগে।

মতি হাসে। আর টোপ গাঁথে নতুন করে।

উটকো মেরে আর বসা যায় না। খোকা পকেট থেকে রুমাল বের করে পেতে তার উপরে বসে। একটা আরামের ভঙ্গি করে। একটা বিড়ির দরকার। গলা খাকারি দেয় খোকা। মতি তাকায়। ডান হাতের দুটো আঙুল ঠোঁটের উপর চেপে ইঙ্গিতে জানায় খোকা। মতি এক পলকে নিমুদাকে দেখে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে।

ছিপটাকে পাড়ের উপর রেখে খোকা মতির দিকে এগিয়ে যায়। মতির ঠিক পেছনটিতে গিয়ে বসে। বলে, কটা বাজে দেখতো?

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে মতি বলে—দুটো। তারপর বলে প্যান্টের ডান পকেটে আছে—নে।

দুটো বিড়ি ও দেশলাইটা বের করে নিয়ে খোকা মতির ফাতনার দিকে একটু চেয়ে দেখে—তারপরে নিমুদার দিকে একবার তাকিয়ে বলে, তা হলে তুই ধর, আমি জায়গায় গিয়ে বসি।

মতি উত্তর করে না। একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিজের জায়গায় বসে মৌজ করে বিড়িটা ধরায় খোকা। তারপর ফাতনার দিকে তাকায়।

আবার অনেকটা সরে এসেছে ফাতনাটা।

হঠাৎ চোখ দুটো বড় হয়ে উঠে খোকার। ফাতনাটাকে জলের নীচে টানছে।

বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডানহাত দিয়ে শক্ত করে ছিপটা চেপে ধরে। চোখের অপলক দৃষ্টি ফাতনার দিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছে খোকা।

আরেকবার টানলেই—

চোখের সামনে খোকা দেখতে পায় যেন তার বঁড়শিতে ঝুলছে—সাদা বেশ বড় একটা পাকদা—

ফাতনাটা একটু একটু কাঁপছে। খোকার চোখের মণি দুটো উত্তেজনায় চকচক করছে—

আবার টান—

খোকা প্রচণ্ড জোরে ছিপটাকে উপরের দিকে টানে। তার মাথার পিছন দিয়ে বঁড়শি সুদ্ধ সুতোটা শব্দ করে ঘুরে আসে।

—অ্যাই, ঐভাবে টানলে মাছ ওঠে—আগেই ছুটে যাবে। মতি ভর্ৎসনার সুরে বলে।

—ফাতনা তো ডুবিয়েছিল—খোকা বলে।

—ডোবাক না। একবার বাধলে যাবে কোথায়—বাপ বাপ বলে উঠে আসবে তখন। আগে টানবি না। অতজোরে টানলে টোঁপ সুদ্ধ পড়ে যাবে।

খোকা সুতোটা বা হাতে চেপে দেখে টোঁপটা সত্যি পড়ে গেছে কিনা। না পড়েনি। আবার জলে ফেলে।

—ফস্‌স—আবার আরেকটা শব্দ।

মতি আরেকটা কি মাছ তুলেছে।

—নিমুদা এবার মাগুর—মতির কথা শেষ হবার আগেই নিমুদা ছিপ টানেন—আরেকটা পাকদা।

খোকা ভাবে, নিমুদা আর মতিটা দেখি টপাটপ তুলছে। অথচ তার ফাতনা চুপচাপ। তিনজনে চুপ। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই। শুধু গদাধর নদীর জল পড়বার শব্দ—কলকল কলকল।

খোকা চেয়ে থাকে ফাতনার দিকে। জলটা খুব পরিষ্কার। তার ফাতনাটার নীচে সাদা সাদা ও মাঝে কালো গোল গোল কি সব। খোকা বোঝে সাদা সাদাগুলো মাটি আর কালোগুলো হচ্ছে শুধু গর্ত। কালো রঙ দেখে মনে হয় ওখানে জল অনেক।

খোকা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি তার ফাতনার ঠিক নীচে লতানো অনেকগুলো শেওলা। জলের রঙের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ে না। খোকা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখল এক রকম ছোট ছোট পোকা, কালো রঙের, জলের মধ্যে ছুটাছুটি করছে। অনেকগুলো।

একটা তিনরঙ্গা পাখি তার ফাতনার উপর দিয়ে কোনাকুনি ছুটে ছুটে যায়। খোকা চেয়ে চেয়ে দেখে।

তার ফাতনার চারপাশের জলটা নিথর। বোবা। কিছুটা নীল, কিছুটা কালো। খোকা একদৃষ্টিতে ফাতনার চারদিকের ঐ বোবা জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। শেওলাগুলো একটু একটু নড়ে।

জলের গায়ে মেঘের ছায়া। খোকা একবার উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে। সারা আকাশটায় মেঘ নেই। অবশ্য এখানে বসে যদ্দুর দেখা যায়। অথচ কেমন করে এক টুকরো মেঘ ঠিক এই খালটুকুর উপরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার ছায়া জলে। দুটো বক উড়ে আসছে।

খোকা তাড়াতাড়ি জলের দিকে তাকায়। জলের ছায়ায় বক দুটোকে কেমন লাগে দেখবে। বকদুটো উড়ে গেল। দুটো খুব সাদা উড়ন্ত ছায়া। মৃদু একটা শব্দ। খোকা শুনল। খোকা আগে শোনেনি এত ভালো করে।

ফাতনাটা একটু একটু কাঁপছে। ঐ তিনরঙা নাম না-জানা পাখিটা জল ছুঁয়ে আবার উড়ে গেল। জলে কয়েকটা সূক্ষ্ম তরঙ্গ উঠল। খোকা লক্ষ্য করল। আস্তে আস্তে ঐ তরঙ্গ বড় হতে লাগল। তার ফাতনায় লাগল। আরো এগিয়ে এল। খোকার মনে হল ফাতনাটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সেও যেন ক্রমশ জলের দিকে এগিয়ে চলেছে। সত্যি যেন সে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে—সত্যি—

—ফস্‌স—নিমুদা আরেকটা কি মাছ তুললেন। এবার কেউ কথা বলল না। খোকা তাকিয়ে দেখল। ফাতনাটা আর তার দিকে এগিয়ে আসছে না। সেও আর জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না।

খোকা ভাবল—তার তো এরকম কোনো দিনও হয় না। আশ্চর্য! সত্যি যেন মনে হচ্ছিল ঐ জল তাকে টানছে। অবাক হয়ে জলের দিকে তাকায়। দোষটা কি তার, না ঐ জলের?

তার দোষ থাকতে যাবে কেন? সে তো শুধু জলের দিকে তাকিয়ে ছিল—ফাতনার দিকে—জলে ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা তো ছিল না।

—কিন্তু জল? ঐ জলেরই বা দোষ কি? সে তো আর কথা বলতে জানে না বা মন্ত্র জানে না। তবে কি তার নিজের মাথাই ঘুরে উঠেছিল?

—কি আজেবাজে ভাবছে সে। জোর করে খোকা ভারমুক্ত হতে চায়। মতির দিকে তাকায়। কই, ওর তো এসব হয় না! তবে তার হল কেন? তবে কি চুপচাপ একজায়গায় বসে থাকার জন্যই এরকমটা হল?

—কিরে খোকা, খাচ্ছে না?

মতির আহ্বানে চমক ফরল খোকার।

—এত চুপচাপ কেন?

—কি করব?

—ছিপটা তুলে ছাখ টোপ খেয়ে গেল কিনা?

মতির কথামতো ছিপটা তুলে দেখে খোকা। টোপ ঠিক আছে।

আবার জায়গা মতো ছিপটা ফেলে।

—চা খেলে এখান থেকে খেয়ে যা—মতি বলে।

—কেন, কটা বাজে?

—তিনটে বেজে গেছে।

খোকা অবাক হয়, এর মধ্যেই তিনটে বেজে গেল। এই তো কিছুক্ষণ আগে শুনল মতির মুখে—বেলা দুটো। আশ্চর্য! এতক্ষণ সে এই সব কথা ভাবছিল তাহলে।

—তুই খেয়েছিস? খোকা বলে।

—এক রাউণ্ড হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কি ভাবছিলি জলের দিকে তাকিয়ে? আমি আবার ভাবলাম বুঝি তোর সিনেমার কাউকে দেখছিলি জলের ভিতরে—তাই আর ডাকিনি। তুই খা এবার—

—এই টান, টান খোকা—চীৎকার করে ওঠে মতি।

খোকা চমকে জলের দিকে তাকায়। তার ফাতনা খুঁজে পায় না। হঠাৎ দেখে ফাতনা জলের উপর পলকের জন্য ভেসে উঠে আবার একটানে অনেকটা

নীচে চলে গেল। খোকা উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই ছিপটা টেনে তোলে। একটা কি যেন বঁড়শির সঙ্গে উঠে আসে অনেকটা। খোকার বুকটা ধ্বক্ করে উঠে।

—যা ফসকে গেল! মতির কথায় খোকা তাকিয়ে দেখে বঁড়শিটা শুধু দেখা যাচ্ছে। যে জিনিসটা ঝুলছিল সেটা নেই।

—আটকায়নি ভালো করে হয়তো—মতি ক্ষোভ প্রকাশ করে। বলে, এদিকে নিয়ে আয় টোপ গেঁথে দি।

আবার ছিপ ফেলে খোকা। সূর্য পশ্চিমাকাশে হয়তো প্রায় হেলে পড়েছে। জলটা কালো হয়ে উঠেছে আরো। খোকা পিছন ফিরে উঁচু ডাঙ্গার কুল গাছটাকে দেখে। কুলগাছটার মাথায় সোনালী রোদ ভীড় করেছে। জল পড়বার শব্দটা আরো স্পষ্ট।

চারটে বেজে গেছে—তাই তো কিছুক্ষণ আগে বলল মতি। এখন নিশ্চয়ই সাড়ে চারটে। মতি এর মধ্যে আট-দশটা নানা রকমের মাছ ধরে ফেলেছে, নিমুদা নাকি আরো বেশি।

আর কিছুক্ষণ পরেই উঠতে হবে।

কিন্তু খোকার এই জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। আরেকটু এগিয়ে বসে খোকা। চারিদিকে দেখে।

ফাতনাটা কাঁপছে। জলটা কালো হচ্ছে। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখে সাদা জলের ফেনাগুলো আরো সাদা হয়ে উঠছে। সাদা—সাদা—সাদা। খোকার মনের ভিতরটা কেমন করে। তাকিয়ে থাকতেই কেমন যেন ভালো লাগছে। খোকা মাথাটা ছুটো গুটোনো হাঁটুর মাঝখানে রাখে। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নীচের দিকে। পায়ের পাতা দিয়ে চেপে ছিপটাকে আঁটকে রাখে মাটির সঙ্গে। তার চোখের সামনে শুধু সাদা ফেনা, জলের কলকল কলকল, শেওলার পাতলা পাতলা দাম—সাদা সাদা, কালো কালো, গোল গোল, গর্ত গর্ত, কালো জল, সাদা ফাতনার ছুঁচালো মুখ। খোকার দৃষ্টি নিস্পলক, নিথর, বোবা।

খোকা দেখছে অনেকক্ষণ থেকেই একটা মাছ টুকটুক্ করে ফাতনাটাকে টানছে।

খোকা দেখছে। টানুক। আরো টানুক। একদম একটানে নীচে নিয়ে যাক…।

একবার নীচে টানল। ছুইবার। আবার টানছে…আবার। খোকা এবার আর উঠল না। বসে বসেই ছিপটাকে টেনে তুলল। সুতোয় একটু টান। একটা মাছ। বঁড়শির মাথায় নড়বড় করছে।

উঠে দাঁড়াল খোকা। একটু খুশী। একটু হাসি। খোকা একটু হাসল ঠোঁট চেপে। তাকাল মতির দিকে।

—কি রে সারাদিন বসে শেষে ঐ পুঁচকে বেলে!—মতি হাসে।

বাঁ হাতে ছিপের সুতোটা চেপে ধরে ছিপটা মাটির উপরে রাখে। মাছসুদ্ধ বঁড়শিটাকে বাঁ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। হাতের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা —মৃদু একটা শিহরণ সারা শরীরে। মাছটা একবার নড়ে উঠল। তার হাতের মুঠোয় মাছটা কতটুকু! মাছটার জীবনের স্পন্দন খোকা যেন অনুভব করল হাতের পাতলা তালুতে।

…বঁড়শিটা মুখ দিয়ে ঢুকে কান্‌কোর পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, বাঁ হাতে চেপে ধরে মাছটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে খোকা।

—ঐটুকু মাছ কিন্তু হা'টা কত বড়! খোকা ভাবে বঁড়শিটা মুখ দিয়ে ঢুকবার জন্যও মাছটা হা'টা বন্ধ করতে পারেনি, খোকা মাছটাকে ঘুরিয়ে দেখে—ভাবে, এটা আবার কি রকমের মাছ? ভেতরের সব কিছুই তো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে দেখি!

মাছের মুখের হা'টার ভিতর দিয়ে খোকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দেয় ভিতরে। সাদা, লাল, নীল নীল কতকগুলি সুতোর মতো কি সব। রক্ত নেই বুঝি এই মাছটার।

ডানহাত দিয়ে বঁড়শিটাকে খুলে আনতে চাইল খোকা, কিন্তু পারল না। একটু জোরে টান দিতেই মুখের অনেকটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।—ইস্! খোকার মুখ দিয়ে হঠাৎই শব্দটা বেরিয়ে যায়।

মাছটা খোকার হাতের ভিতরে আরেকবার নড়ে উঠল। এবার একটু জোরে।

—এদিকে নিয়ে আয় ছিপ—টোপ গেঁথে দি। মতি বলে।

আবার ছিপ ফেলে খোকা। এবার ছিপটা ডানহাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি ফাতনার দিকে। শেওলাগুলোকে আর দেখা যায় না। জল আরো কালো। খোকা ভাবে মাছ বুঝি এই টানল—ঐ ফাতনা ডুবল…।

—এবার উঠতে হবে রে খোকা—নইলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে, মতি বলে উঠে।

খোকার নজর তখন ফাতনার দিকে।

একটু একটু কাঁপছে···। খোকার সমস্ত সত্তা ভাবছে—এই বুঝি মাছ এল···খেল—

ছিপটাকে তোলে। আবার সরিয়ে ফেলে খোকা।

—অ্যাই, একটা ধরেই অত ফুর্তি, অত জায়গা বদলালে মাছ খায় না—মতি বুঝি বিদ্রূপ করে।

খোকা উত্তর দেয় না।

—নে, এবার ছিপ গুটো—নিজের ছিপ গুটোতে গুটোতে মতি বলে।

—কেন রে, হয়ে গেল? খোকা জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, এখন আর মাছ খাবে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—তাছাড়া শীত পড়লে মাছ কম খায়। মতি উঠে দাঁড়িয়ে ছিপের গায়ে সুতো জড়ায়।

এগিয়ে আসে খোকার দিকে।

—নিমুদা এবার উঠুন, দেরি হয়ে যাবে, খোকার দিকে এগুতে এগুতে মতি বলে।

খোকার একদম পাশে এসে দাঁড়ায় মতি। ফাতনাটা একবার দেখে। তারপর খোকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, নে ওঠা—অনেক ধরেছিস। আরেক দিন আসা যাবে।

খোকা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখে ফাতনা ডুবল কি না। ফাতনা আর ডোবে না।

একটানে ছিপটাকে তুলে ফেলে খোকা। তারপর ছিপের গায়ে সুতো জড়ায়।

মতি গদাধরের জলে হাত ধুচ্ছে, এদিকে খালের দিকে পিছন ফিরে। নালার মতো নদীটা। হাত দুয়েক চওড়া। মতি এপারে এক পা, ওপারে এক পা রেখে হাত ধুচ্ছে। মতিটাকে যেন কেমন লাগছে। তার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে সাদা জলের রেখা।

খোকা এগিয়ে যায়।

—ছিপটা রেখে হাত ধুয়ে নে—মতি বলে।

ছিপটা পাড়ে রেখে সেও মতির মতো দুপা ফাঁক করে একটু ঝুঁকে পড়ে দু হাতে গদাধরের জলকে স্পর্শ করে। একদম ঠিক মতির মতো ভঙ্গি করে। ঠাণ্ডা গতিসম্পন্ন একটা স্পর্শ—জলটা বেশ জোরেই আসছে। খোকা সেটা বোঝে।

মতি বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে। হাত চারেক দূরে। খোকা ঘাড় বেঁকিয়ে একটু দেখে। মতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে—ঠিক যেমন করে সে বঁড়শিতে আটকানো মাছগুলোকে দেখে।

খোকা মুখে জলের ঝাপ্‌টা দেয়।

মতি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, নিমুদা আপনি আসুন—আমরা আলের ধারে অপেক্ষা করছি। নিমুদা তখন ছিপ গোটাচ্ছিলেন।

দুটো ছিপ নিয়ে খোকা মতিকে অনুসরণ করে।

হেলানো সাইকেলটা উঁচু ডাঙার গা থেকে তুলতে তুলতে খোকার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ দুটো নাচিয়ে হাসি মুখে মতি বলে, কেমন লাগল মাছধরা?

—জায়গাটা খুব সুন্দর বুঝলি? রোদমাখা উঁচু ডাঙার কুলগাছটার দিকে তাকিয়ে খোকা উত্তর করে।

—খুব না বলছিলি এখানে এসে ভেরাণ্ডা ভাজার চেয়ে সিনেমা দেখা ভালো, তাস পিটনো ভালো। মতি হাত দিয়ে সাইকেলের সিটের ময়লা পরিষ্কার করে।

খোকা একবার মতির দু চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকায়। সে দৃষ্টি যেন বলতে চায়: কি আর বলব বল—কিচ্ছু বলার নেই।

মতির থলেতে অনেক মাছ। হাসিমুখে থলেটা একবার দুলিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে দেয় মতি।

খোকা চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখে।

বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হাত দুটো আরো ঠাণ্ডা। হাওয়া নেই। ধানগাছগুলি একদম স্তব্ধ। একটুও শরশরানি নেই। খোকা সেটা লক্ষ্য করে।

মুখোমুখি পশ্চিমাকাশে খণ্ডখণ্ড মেঘের স্তূপ। কালো আর লাল রঙের ছড়াছড়ি সেখানে। পাকা রাস্তাটার ওপারে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে অন্ধকারের মধ্যে আকাশটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

খোকা বলে, তোরা কি প্রত্যেক রবিবারেই আসিস নাকি রে?

—কেন তুইও আসবি নাকি? রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মতি বলে।

—আসতে পারি, খোকা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলে।

—সিনেমা? কথাটা বলে মতি হাসে খোকার মুখ চেয়ে।

—ঐ যে নিমুদা আসছেন, চল হাঁটা শুরু করি। মতি সাইকেলটা নিয়ে চলতে শুরু করে। খুব খুশি-খুশি ভাব মতির। খোকা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মতির হাসিটাকে।

"আকাশ আর এই মাটি, ঐ দূ-উ-রে যেথায় মে-লে…" মতি গান গাচ্ছে। খোকা শোনে কিন্তু চোখ ফেরায় না সেদিকে।

সেই কুলগাছটার নীচে নিমুদা এসে দাঁড়িয়েছেন। খোকা চোখ তুলে দেখে। নিমুদা—তার পিছনে কুলগাছ—তার নীচে গদাধর নদী—সাদা ফেনা—শেওলা দাম—গর্ত, কুলকুল শব্দ—ফাতনার সুঁচলো মুখ। খোকা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়।

—টিং টিং টিং। এই খোকা আয়, ওখানে হাঁ করে কি দেখছিস?

মতির চীৎকারে আর বেলের আওয়াজে চমকে ওঠে খোকা।

বেশ খানিকটা দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে মতি। একটা হাত সাইকেলের বেলের উপর।

নিমুদা ঢালু জমি বেয়ে নেমে আসছেন।

ছুটো ছিপ নিয়ে খোকা এবার মতির দিকে এগোয়—

মতি যেন তাকে উদ্দেশ্য করে আরো কি সব বলছে—খোকা যেন কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না স্পষ্ট করে।

আইনস্টাইন ও কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতির স্বরূপটি কি? এই মহাবিশ্বের সমস্ত কাজ চলছে কোন্ কোন্ শক্তির ক্রিয়ায়? দেশ, কাল আর পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় যে অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ, যে-শক্তির টানে প্রত্যেকটি গ্রহ নিখুঁত আর সুনির্দিষ্ট একেকটি কক্ষপথে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে, সেই শক্তিটিরই বা স্বরূপ কি? এসব প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে-শাখায় সমগ্রভাবে মহাবিশ্বের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা-অনুশীলন করা হয়, সেই শাখাটির নাম ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বা "কস্‌মোলজি"। এই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের তত্ত্বগত ভিত্তিটি হল আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদ্ বা "জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"। এই আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারাই আইনস্টাইন সর্বপ্রথম দেশ (স্পেস্), কাল (টাইম) আর জড়ের (ম্যাটার) পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রয়োগ করার আগে ওই তত্ত্বটিকে আমাদের যাচাই করে নিতে হবে; অর্থাৎ, আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তগুলি কতটা সঠিক সেটা জানা চাই। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটা খুব চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি—কারণ, এই তত্ত্বের সঙ্গে যে নতুন নতুন কার্যকারণগুলি সংশ্লিষ্ট এবং যে-কার্যকারণগুলির পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) যাচাইয়ের সম্ভাবনা আছে, তা নিতান্তই কম। বৈজ্ঞানিকরা যে আইনস্টাইনের তত্ত্বের যথার্থতা যাচাই করার জন্যে অনবরত নব নব পদ্ধতি অনুসন্ধান করে চলেছেন, এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা একটি নতুন আর রীতিমত নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়েছেন এই আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে। মানুষের হাতে-গড়া অনেকগুলি কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হবার পর তাঁরা মনে করছেন যে এর থেকে সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের কাজে তাঁরা বিরাট সাহায্য পাবেন।

মূল নীতি

আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-যাচাইয়ের ব্যাপারে স্পুৎনিক আর ল্যুনিক যে কি-ভাবে কাজে লাগতে পারে সেটা বুঝতে গেলে আগে আইনস্টাইনের ওই তত্ত্বটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা চাই। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধারণা করাটা অসম্ভব। তাই, খুব ভাসাভাসাভাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে অতি সরল করে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে নেবার চেষ্টা করা যাক। বলে রাখা ভালো, এর থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব স্পষ্ট না হলেও, গ্রহগুলির সূর্য-প্রদক্ষিণ আর বিশেষত স্পুৎনিকগুলির পৃথিবী-প্রদক্ষিণ থেকে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে লেভেরিয়ে নামে একজন ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী বুধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন: অন্যান্য গ্রহের মতোই এই বুধ গ্রহ তার কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে একবার করে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে এসে পৌঁছয়, আবার ক্রমশ দূরে সরে যায়। গ্রহদের এই কক্ষেরও একটা গতি আছে—যদিও এই গতি অত্যন্ত মন্থর। সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে গ্রহের এই অবস্থানকে বলা হয় অনুসূর বা "পেরিহিলিয়ন"। কক্ষের গতি আছে বলে এই অনুসূরেরও গতি আছে। লেভেরিয়ে লক্ষ্য করলেন, বুধের এই অনুসূরের গতিটা বুধের গতিমুখের (ডিরেকশন) দিকে অতি সামান্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। লেভেরিয়ে প্রথমে ভাবলেন যে বুধের অনুসূরের এই গতিবৃদ্ধির কারণ হল অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়া। কিন্তু তিনি অঙ্কের হিসাব কষে দেখলেন যে অন্যান্য গ্রহের মহাকর্ষের ক্রিয়ায় বুধের অনুসূরের যতটা গতিবৃদ্ধি হওয়া উচিত, আসলে তার চেয়ে বেশি গতিবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যাপারটা সমস্ত দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর পদার্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, কেউ এটার ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না।

এর অনেক পরে, ১৯১৫ সালে, আইনস্টাইন তাঁর সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বুধের এই কক্ষের ঘূর্ণ্যন-গতি অত্যন্ত কম। বুধ-কক্ষের ৩৬০ ডিগ্রি অর্থাৎ সম্পূর্ণ এক পাক ঘুরতে সময় লাগে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। সুতরাং এই গতিকে যথেষ্ট সঠিকভাবে মাপতে গেলে বুধ গ্রহের গতিবিধি আর এক অনুসূর প্রায় দু-শো বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে সেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে কাজে লাগাতে হবে।

এই তো গেল বুধ-কক্ষের ঘূর্ণ্যন-গতি। অন্যান্য গ্রহের বেলায় তাদের কক্ষ-ঘূর্ণ্যনের গতি এতই কম যে এখনও পর্যন্ত হিসাবই করে ওঠা যায় নি।

সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিও প্রমাণ করা কঠিন। সূর্যের অথবা কোনো তারকার কাছ দিয়ে যখন একটা আলোক-রশ্মি চলে যায় তখন সেই রশ্মির গতিপথ কিছুটা বেঁকে যাবেই—এই হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তের মূল কথাটি হল—আলোর এনার্জি রয়েছে, অতএব তার একটা ভর বা "ম্যাস্"ও রয়েছে; এবং মহাকর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোর এই ভর সূর্যে বা তারকার ভরের টানে আকৃষ্ট হয় বলেই আলোক-রশ্মির পথটা বেঁকে যায়। আলোক-রশ্মির এইভাবে বিপথচালিত হবার ব্যাপারটাকে বলা হয় বিক্ষেপ বা "ডিফ্লেক্শন"। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই-যে, এই বিক্ষেপের মাত্রা—অর্থাৎ কতটা পরিমাণে আলোর পথটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—জানা না থাকলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু দূরের তারকাদের সঠিক স্থিতিস্থানকে তাঁদের দূরবীণ ইত্যাদির মারফতে নির্দেশ করতে পারেন না।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের তৃতীয় আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রমাণ করা আরও কঠিন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিভিন্ন নক্ষত্র তারকা ইত্যাদি থেকে পৃথিবীতে যে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এসে পৌঁছয় সেই তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা) অভিকর্ষ-শক্তির প্রভাবে বদলে যায়। জ্যোতির্মণ্ডলীয় অবস্থাধীনে এই পরিবর্তন কি পরিমাণে ঘটে সেটা বৈজ্ঞানিক এ পর্যন্ত হিসাব করে উঠতে পারেন নি।

সৌর-পরিবার ও মহাব্রহ্মাণ্ড

আইনস্টাইনের তত্ত্বের এই নতুন কার্যকারণগুলি যদি এতই যৎসামান্য হয়, তাহলে এই তত্ত্বটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? আপেক্ষিকতাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্যে যে আমাদের সৌর-পরিবারের পক্ষে এই তত্ত্বের কার্যকারণগুলি যৎসামান্য হলেও মহাব্রহ্মাণ্ডের সুবিপুল বিস্তারের ক্ষেত্রে এই সামান্যীকৃত আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব-প্রয়োগ নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে যায়।

আর, এই মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তনের তুলনায় আমাদের এই সৌরমণ্ডল হল গিয়ে এক পুকুর জলের মধ্যে একটি জলবিন্দুর মতো।

আমাদের এই সৌর-পরিবার যে "মহাজাতিক মাপকাঠি"র হিসাবে কত ক্ষুদ্র, তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে এই উদাহরণটি থেকে: সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে লাগে আট মিনিট; সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে এমন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে লেগেছে ১০০ কোটি বছর! অর্থাৎ, সেই নক্ষত্র থেকে যদি কোনো মানুষ পৃথিবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে ১০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থা চাক্ষুষ জানতে পারত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সৌর-পরিবারের তুলনায় মহাব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত বিপুল।

কিন্তু তবু, সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বকে মহাবিশ্বের অনুশীলন-ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারি না—যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্তমান প্রাকৃতিক পরিবেশে এই তত্ত্বের পরিমাণগত কার্যকারণগুলিকে একেবারে নিখুঁতভাবে আমরা যাচাই করে নিতে পারছি।

কিভাবে এই যাচাইটা করা যেতে পারে?

কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলির সাহায্যে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব-যাচাইয়ের জন্যে এক্ষেত্রেই ল্যুনিক-স্পুৎনিকের অন্যতম কার্যকারিতার প্রশ্ন উঠছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের ঘূর্ণ্যন-কোণ গ্রহগুলির কক্ষের ঘূর্ণ্যন-কোণের চেয়ে ঢের বেশি—বুধের কক্ষের ঘূর্ণ্যন-কোণের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণ বেশি। ইতিমধ্যেই এই স্পুৎনিকগুলির সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতিটা নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পৃথিবীর ভেতরে পদার্থ কিভাবে ছড়িয়ে আছে আর কোন্ জায়গায় তার ঘনত্ব কতটা, তাও জানা গেছে। স্পুৎনিকের গতিবিধির ওপরে চাঁদের মহাকর্ষ আর পৃথিবীর আবহমণ্ডল কতটা আর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। এইসব হিসাব নিখুঁতভাবে পাওয়ার পরে, কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের হাতে এমন নিখুঁত আর সূক্ষ্ম যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে যা দিয়ে আইনস্টাইনের এই তত্ত্বটির উপরোক্ত কার্যকারণগুলিকে যাচাই করে নেওয়া যাচ্ছে, মহাব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই, আপেক্ষিকতাবাদের তৃতীয় সিদ্ধান্তটিকে—অর্থাৎ, স্পুৎনিক থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গগুলির ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীর অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের

প্রভাবে কতটা আর কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—সেটা কৃত্রিম উপগ্রহগুলির সাহায্যে অনেকখানি যাচাই ও নির্ধারণ করা গেছে।

সময় ও গতি

এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের আরেকটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কথাও বলা দরকার। এটা হল: গতির ওপরেই সময় নির্ভর করে। অর্থাৎ গতি যত বাড়বে সময়ও ততই মন্থর হয়ে আসবে—আলোর গতিতে যদি কোনো মানুষ মহাশূন্য দেশে চলে, তাহলে তার কাছে সময়ের প্রবহমানতা প্রায় থাকবে না বললেই চলে। ধরা যাক, এমন একটা মহাব্যোমযানে চেপে আমরা চলেছি যার গতি আগের গতির নয়-দশমাংশ বা সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল। সেক্ষেত্রে এই মহাব্যোমযানের ভেতরে আমাদের কাছে সময়ের মাত্রা দাঁড়াবে পৃথিবীর সময়ের মাত্রার অর্ধেক মন্থর—অর্থাৎ পৃথিবীর এক দিন হবে এই মহাব্যোমযানের ভেতরের ১২ ঘণ্টার সমান; পৃথিবীতে যে-মানুষের ৮০ বছর বাঁচার কথা, সেই মানুষ যদি আজীবন এই মহাব্যোমযানের ভেতরে থেকে যায় তাহলে সে বাঁচবে পৃথিবীর হিসাবে ১৬০ বছর। —অবশ্য সে নিজে এ সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না।

কিন্তু স্পুৎনিকের বেলায় সময়ের এই তারতম্যটুকু নিতান্তই নগণ্য। আমাদের কাছে কৃত্রিম উপগ্রহের সেকেণ্ডে ৫ মাইল গতি প্রচণ্ড হলেও, আলোর গতির কাছে সেটা কিছুই নয়। তাই লাইকার পক্ষে সময়ের মন্থরতা মোটেই লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে নি—কারণ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল গতিতে যে চলেছে, তার কাছে সময়ের প্রবহমানতার মাত্রা কমে আসবে এক বছরে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। তা সত্ত্বেও, পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে সময়ের এই অতি সূক্ষ্ম তারতম্যটুকুও ধরা সম্ভব। ইদানিং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এমন নিখুঁত পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে তিন হাজার বছরে এক সেকেণ্ডের তারতম্য ধরা যায়। তাছাড়া, ভবিষ্যৎ মহাব্যোমযান ও স্পুৎনিকগুলির গতিও আরও বাড়ানো যাবে। এর ফলে আইনস্টাইনের সামান্যীকৃত আপেক্ষিক তত্ত্বের তৃতীয় কার্যকারণের সিদ্ধান্তগুলিকেও যাচাই করা চলবে—যা এ পর্যন্ত প্রয়োগ-পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভিতালী গিন্‌সবুর্গ লিখিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে।

কুয়াশা

কার্তিক লাহিড়ী

বাস থেকে নেমে পুলিন এগিয়ে আসছিল বিষ্ণুর বাড়ির দিকে।

'এই তোর সাড়ে আটটা ?'

বিষ্ণুর আকস্মিক প্রশ্নে পুলিন থতমত খেল, 'না মানে, বাসটা বড়—' নিজেকে ঠিক করে নিতে নিতে একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করল।

'আজও তোর দেরি করে উঠতে লজ্জা করল না।' বিষ্ণুর কথায় উষ্মা।

পুলিন হাসল। জানে, বিষ্ণু রাগ করে নি—দেরি করার জন্যে বকছে।

'আবার হাসছিস। অশোক এতক্ষণ বসে থেকে থেকে—'

পুলিনের হাসি হঠাৎ চুপসে গেল। অশোকের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার ঢেউ বুকে আছড়ে পড়ল।

'অশোক কি…?'

'না, ভাবনার কিছু নেই। ও, সব ঠিক করে এসেছে।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পুলিন। একটু দম নিয়ে বলল, 'রাস্তায় এমন করে বকবি, না, বাড়িতে গিয়েও কিছু হবে ?'

বিষ্ণু হেসে ফেলল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ঠিক ছটায় যেতে হবে।'

'ছটায় ?'

'আগে যেতে চাস ?' বিষ্ণু থামল, 'রেজিস্ট্রার যে সময় দিয়েছেন তার আগে গিয়ে কি কিছু উপরি লাভ হবে ?'

পুলিন কথা খুঁজে পেল না। বিষ্ণুর পাশাপাশি নিঃশব্দে চলতে লাগল। এক সময় থামল বিষ্ণু, 'আমি আবার ফিরছি কেন ? তুই যা। সব ঠিক আছে।'

'তোর কাজ আছে ?'

'হ্যাঁ, শালা আবার ডেকেছে। না গেলে'—মনে মনে বিজ বিজ করল বিষ্ণু।

পুলিন হাসল, 'দেখ, এবার নাক খুলে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। বেশ আহ্লাদ আর কি! আনন্দ ধরছে না যে ?'

দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে বিষ্ণু হাঁক দিল, 'মা—চা।'

বিছানায় বসতে বসতে পুলিন বাধা দিল, 'থাক চা। এই মাত্র—'

হেসে উঠল বিষ্ণু, 'ইকনমি ড্রাইভ! রত্না শেখাচ্ছে বুঝি ?'

পুলিন উত্তর দিল না। হাসল। একটু চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের বাড়িতে কোনও……'

'কিচ্ছু না। অশোক যখন আছে, তখন,' ইঙ্গিতে কথা শেষ করল।

'তবে ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

'কেন ?' প্রশ্নটা ফস করে মুখ থেকে বেরুতেই লজ্জা পেল পুলিন। লজ্জা ঢাকার জন্যে প্রশ্ন জুড়ল, 'তোর না গেলেই কি চলবে না ?'

'না। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম। তুই স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে নে। তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ ফিরব।'

বিষ্ণু যেতে গিয়ে থামল, 'নিখিলবাবুকে বলেছিস ?'

'না', পুলিনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'নিখিলদা বোধ হয় রাগই করেছেন।'

'কেন ?'

'বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন কোথায় যাচ্ছি, কি ব্যাপার, কি কাজ। আমিও থাকতে না পেরে আচ্ছা করে—'

'ওই তো তোর দোষ। একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়িস।'

বিষ্ণুর কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পুলিন। রত্না ? রত্নার প্রতিধ্বনি!

'তুমি বড্ড অস্থির। সব কথা ভেবে চিন্তে—'

রত্নার ভ্রূ—চোখ। বিরক্ত। রত্না বিরক্ত হয় আমার ওপর ?

'তুই রেডি থাকিস।'

পুলিন কোনোমতে সম্মতি জানাল।

'আমার যদি আসতে দেরি হয়, স্ট্রেট্ চলে যাস।'

'না। তুই না এলে…আমার কেমন ভয় করছে।'

'হুঁ।' ছদ্ম গাম্ভীর্যে বিষ্ণু বলল, 'প্রথম প্রথম এমন হয়।'

'সকলের ?' পুলিন ভুলেই গেল বিষ্ণুর এ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। বিষ্ণু উত্তর দিল না। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল এমন সবার হয়।

'মাসিমাকে জানিয়েছিস ?'

'না। সময় পাই নি। আর তুই করছিস লুকিয়ে বিয়ে সে-কথা জানতে পারলে মা আর…'

পুলিনের বুক ধ্বক করে উঠল। লুকিয়ে বিয়ে! রত্না যদি ছুটে না আসত তবে কি এত তাড়াতাড়ি…

বিষ্ণু চলে গেল। সমস্ত ঘরটা থম মেরে আছে। পুলিন যেন অকুল পাথারে।

'তোমার বাবাকে এ বিষয়ে না জানিয়ে—'

'না-না, তুমি তো জান না বাবা-মা জানলে'…রত্নার চোখে জল। দাদার ওই রকম অসুখ তারওপর…' রত্নার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করলে—'

'ওদিকে দিন ঠিক। এঞ্জিনিয়র পাত্র—ছশো টাকা মাইনে। বাবার বাল্য-বন্ধুর ছেলে।'

রত্নার মুখে আশ্চর্য করুণা। রত্না করুণ। আমি থাকতে পারলাম না।

'কিন্তু আমার আয় ?'

'তাতে কি ? আমি তো লেখাপড়া শিখেছি। দুজনে মিলে—'

'তবু ছশো টাকা থেকে দুশো টাকার—'

'ছি-ছি, মুখে কিছু আটকাল না। আমি এমন অবুঝ যে—'

রত্নার চোখে অঝোর ধারা। না-না। আমি ভুল করি নি। রত্না এসেছে সব ত্যাগ করে।

যদি কিছু হয় ?

ছি—পুলিন! রত্নাকে না তুমি ভালোবাসো ? ভালোবাসার জন্য মেয়েটা ছুটে এসেছে এতদুর, অথচ…ধিক তুমি…ধিক…

উত্তেজনায় সরে এল পুলিন। অচেতনেই এগিয়ে এল রেগুলেটারের দিকে। পাখা চালিয়ে দিল। ভুলে গেল, এটা শীতকাল।

'স্নান করবে না ?'

মাসিমার কথায় সম্বিত ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি পাখা বন্ধ করে দিল।

'বাথরুমে সব রাখা আছে। খোকার যা পাগলামি—'

পুলিন হাসল। হাসল, কারণ না হেসে কি বলবে।

'তোমাদের দুটি বন্ধুর যা কাণ্ড-কারখানা। কি দরকার ছিল—'

পুলিনের বুক কেঁপে উঠল। মাসিমা কি তবে জেনে ফেলেছেন ? ছি-ছি, বিষ্ণুটা যে কি…এমন বিশ্বাসঘাতকের মতো কাজ করে ?

মাসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিন পালাতে পারলে বাঁচে।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।'

মাসিমা হাসলেন, 'অশোক আবার না খেয়েই বেরিয়ে গেল। বললাম খেয়ে নাও দুটি, তা কি শুনবে। কেবল ছন্‌মন্‌ ছন্‌মন্‌।'

আশ্চর্য! অশোকটা সত্যি আশ্চর্য! বুকে এমন জ্বালা, অথচ…; ওর মতো ছেলেকে কি করে নীলা…

অশোকের চোখ। কালো, করুণ। রত্না কাঁদছে। নাকি রত্নার চেহারার সঙ্গে ওর একটা মিল আছে ? বিষ্ণু। বিষ্ণুর কি হয় ? আমি আর রত্না যখন…

মাসিমা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে দৃষ্টি ফেলল। মাসিমা চলে গেছেন। মাসিমাকে এত ভালো লাগে। বিষ্ণুটা সত্যি ভাগ্যবান। এমন মা!

বিছানায় গা এলিয়ে দিল। আহ্—! রত্না যদি এ-সময় আসত একবার। রত্না কি করছে এখন ? কাল সারারাত ঘুম হয় নি। বিয়ে করার আগে সবার এমন হয় ? বিষ্ণুর হবে ? বিষ্ণু কি ভাবে আমাদের, বোকা ? বিষ্ণুর মন নেই ? প্রেমের কথা শুনলে কেবল হাসে।

সিলিঙে দৃষ্টি পড়ল। তিনটে ব্লেড। ফ্যান। বাতাসে নড়ছে। এক-দুই-তিন। ধীরে ধীরে ঘুরছে।

বিষ্ণু। অশোক। রত্না। বিষ্ণুর এতটুকু ঈর্ষা নেই ? আমি আর রত্না যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করি,…বিষ্ণু মানুষ নয় ? বিষ্ণু প্রেমে পড়ে নি ? নাকি লুকোয় আমাকে ?

'সব কথার উত্তর দিতে নেই।'

'আমাকেও না ?'

'না।'

বিষ্ণু আমার এতদিনের বন্ধু অথচ আমাকেও সব বলে না। রত্না কি বলে ? অশোক তো লুকোয় নি কিছু। কিন্তু নীলা ? নীলা খেলালো অশোককে। রত্নার তিল। ওগো দুঃখ জাগানিয়া। রত্না কি আমায়—

'আমি যাবো সোনারপুর।'

সোনারপুর! সোনারপুরের কথা ওকে বলতে পারি না। রত্না জিজ্ঞেস করলে কিন্তু আমি ··আমি কি···

'শুয়ে পড়লে যে?'

মাসিমার গলা শুনে উঠে বসল পুলিন।

'চান করে এসো। ভাত একদম জল হয়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল পুলিন। মাসিমার সামনে দাঁড়াতে কেমন লজ্জা করছে। মাসিমার হাত থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কোনোমতে পাশ কাটিয়ে প্রায় দৌড়ে ঢুকল বাথরুমে।

ভাত খেতে খেতে মাসিমা একসময় প্রশ্ন করলেন, 'তুমিও কি বিষ্ণুর মতো প্রতিজ্ঞা করলে?'

'কি?' ভাত থেকে মুখ তুলে চোখ মেলল মাসিমার মুখে।

'বিয়ে করবে না?'

মাসিমার মুখে হাসি। হাসিটা খুব ভালো লাগল পুলিনের। বহুদিন পর মনে হল মা-র সামনে বসে ভাত খাচ্ছে। মা-র সামনে, মা-র কথা মনে পড়তে বুকে একটা হাহাকার উঠল। কতদিন, কতদিন সোনারপুর যাইনি।

আস্তে করে বলল, 'জানেনই তো। বাবা অথর্ব, তারপর বিবাহযোগ্যা দুটি বোন। বিধবা বোনের ভার আমারই ওপর। ভাইগুলি মানুষ হল না। সব দায় আমাকেই টানতে হয়।'

'সে তো সবারই। তবু এর মধ্যে লোকে সংসার করছে। বিষ্ণুকে কত বলি···'

পুলিনের ইচ্ছে করল, বলে, মাসিমা—বিষ্ণু আমার চেয়ে মাইনে বেশি পায় আর সংসার বলতে আপনি আর সে···তবু বলতে পারল না। একটু থেমে বলল, 'তা করছে। কিন্তু আমি যা মাইনে পাচ্ছি—এই একশো নব্বই টাকায় নিজেরই চলে না, তারপরে বিরাট সংসার···'

বলতে বলতে থেমে গেল পুলিন। মাসিমাকে নির্বিবাদে বললাম সব কথা, অথচ রত্নাকে? রত্নাকে বলতে ভয় পাই? কতটুকু সে জানে আমাদের সংসারের। সে কি জানে বড়দি···বললেই বলবে, টাকা কি একটা বড় ব্যাপার। আসল কথা হচ্ছে ··

বুঝি, বুঝি। প্রেম সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু শুধু আমাকে নিয়েই রত্না খুশি? রত্না কত কথা জিজ্ঞেস করে আমাদের, তবু আমি···

'কি হল, খাচ্ছ না যে?'

'এই খাই।' খাওয়ায় মন দিল পুলিন। রত্না সব বোঝে। তবু কি বুঝতে পারবে, বড়দি একটা জঘন্য কুৎসার জন্য বিতাড়িত হয়েছেন। মেজদি বিধবা, তার কথা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তোলে। ভাইবোনরা সব ···শুধু আমি···আমিই একমাত্র···

'মাছ দিয়ে ভাত মেখে নাও।'

যন্ত্রচালিতের মতো আদেশ মান্য করল। বাবা আমায় ভালোবাসেন কিন্তু যখন মাথা বিগড়ে যায়—

'আর একটু ভাত দি?'

'না। আজ এমনিতেই।' পুলিন হাসল।

'আজকাল ছেলেদের ওই এক ধরন। কিছুতেই ঝুঁকি নেবে না। বলবে মাইনে কম। মেয়েরাও হয়েছে তেমনি। ওরাও আজকাল—'

মাসিমা বলছেন। পুলিন অন্যমনস্ক। সংসারে অর্থ-ই কি সবচেয়ে বড় ঘটনা? রত্নারা বড়লোক নয়। রত্নার ভাইয়ের···ভাবতেই থমকে গেল। রত্নার ভাইয়ের যে অসুখ, মনে মনে শিউরে উঠল পুলিন। রত্নার যদি ওই রোগের···না-না। তাড়াতে চাইল ভাবনা।

'তোমাদেরও বলি টাকাপয়সা খুব একটা···'

মাসিমা বলে যাচ্ছেন—ঠিক মার মতো। সব মা-ই এমন বলেন? রত্না যখন এমন হবে, চিন্তা আসতে লজ্জা পেল।

'পেট ভরেছে তো?'

'বাপ। এত খেয়েছি।' বলেই উঠে পড়ল।

মুখ ধুয়ে ঘরে এল। কেমন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজ সকালে দিব্যি খোশ-মেজাজে ছিল। কিন্তু এখন, ঠিক খাওয়ার পর, মাসিমার সঙ্গে কথা বলার সময় থেকে, সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

অশোকটা কি? বিয়ে করবে না? মাসিমাকে সব বললাম অথচ রত্নাকে···রত্না, আমার ভাবী-স্ত্রী। তাকে আমি···রত্নাই কি সব কথা বলেছে আমায়। ভাবতে ভাবতে থামল পুলিন, না-না। সব কথা সবাইকে বলা যায় না। বিষ্ণু ঠিক। তবু আমি বলেছি।

মিছে কথা। তুমি বল নি।

নিশ্চয়ই বলেছি। রত্না জানে। রত্না বলেছে সে মানিয়ে নেবে।

'আমার তো কোনো কথাই তোমার অজানা নয়।' ময়দানের নির্জনতা। অজানা? কেন?

'যারা দেহকে মূলধন করে তারাই এমন রহস্য করে দেহ নিয়ে।' রত্না হাসছে। রত্নার তিল—রত্নার ঠোঁট।

'আমি যদি পালাই?'

'পালাবে?' রত্না পাগলের মতো হাসছে, 'পালাও দেখি?'

এত জোর রত্নার? আমি তো পালাতে পারলাম না। কেন? এত দৃঢ় রত্না? একেই কি বিষ্ণু ব্যক্তিত্ব বলে? পুলিন কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করল।

রত্নার মুখ। রত্নার চোখ। রত্নার সমস্ত শরীর···সব কিছু ছাপিয়ে, পুলিন ভাবল, কি আছে যা আমাকে পাগল করে, উদ্দীপ্ত করে, এগিয়ে নিয়ে যায়। রত্না উজ্জ্বল, হাস্যময়। কিন্তু ওর কথা···গান। প্রেম কি তবে ব্যক্তিত্ব? তবে কি দেহ? দেহ ফুরিয়ে গেলে···আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে···।

পাখা খুলে দিল পুলিন। শুয়ে পড়ল বিছানায়। ব্লেডগুলোর অস্তিত্ব মিশে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে। এক···দুই···।

প্রেম। ব্যক্তিত্ব। দেহ। রত্না। মন। অশোকের, বিষ্ণুর···রত্নার মধ্যে কি আছে? রত্নার জন্যে ফ্ল্যাট। নির্জনতা।

পাশ ফিরল পুলিন।

রত্না কত সহজ আমার কাছে কিন্তু আমি যে পারি না। লুকিয়ে বিয়ে—পাশ ফিরল আবার।

'জানই তো বাবা-মার কাছে আমি কেমন দুর্বল। ওখানে যেন—'

'কিন্তু বাবা-মাকে জানিয়ে করলে কত ভালো হত।'

'সে তো জানি। তুমি তো বুঝতে পারছ ওই একজায়গায়—'

বাবা-মাকে ভয় করে রত্না? আমি ভয় করি বাবাকে। ভয়, না ভালোবাসা?

ভয় থেকে ভালোবাসা। রত্নাকে আমি ভয় করি? ভয়! জোরে হাসতে চাইল পুলিন। চিত হলো। রত্নাকে নিজের মতো গড়ব। সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে। গান। শুধু গান। কতদিন এমন লুকিয়ে···থমকে গেল আবার। না। এই ভালো। সেই ভালো, ওগো সেই ভালো। অশোক, বিষ্ণু। থাক না লুকনো। বিষ্ণু কি বলে? অশোকটা অস্থির, চঞ্চল। আমার বিয়ে—রত্না আমার···না-না। ভয় করব না।

পুলিনের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল, ঘুম পাচ্ছে। আজ ঘুম পাচ্ছে! ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করল। রত্না কি ঘুমুচ্ছে?

পুলিনের চোখের সামনে ভেসে উঠল রত্নার মুখ···রত্নার ছবি···রত্নার মন ···রত্নার শরীর।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্দিষ্ট স্থানে যখন বিষ্ণু আর পুলিন এসে পৌছল, তখন ছটা বেজে গেছে। ঘরে ঢুকতেই নিমেষে শরীর ভার হয়ে উঠল। বুকের ভেতর গুরগুর করতে লাগল। সমস্ত ঘরটা যেন ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি। চোখ মেলল সামনে। অশোক ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে।

'কিরে?' অশোকের চোখে কৌতুক।

পুলিন হাসল। জোর করেই হাসল এবং অশোককে ওই হাসিতে জবাব দিয়ে খুঁজল রত্নাকে।

রত্না মুখ নিচু করে বসেছিল। গুঞ্জন শুনেই বোধহয় সামনে তাকাল। পুলিনের চোখে রত্নার চোখ। রত্না হাসল। হাসিটা কেমন ভীরু-ভীরু।

পুলিন একটু এগিয়ে এল। পা কাঁপছে। এগিয়ে এসে রত্নার কাছে বসতে চাইল।

'কিরে', ঠেলা মারল অশোক। 'বেড়ে ছিলি। আমি তো ভাবলাম', অশোক পুলিনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আর একজনকে ইঙ্গিত করল। একটা ছেলে। ছেলেটা ভেতরে গেল।

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্।'

পুলিন ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এ-ঘরে ঢোকা অবধি কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। টেবিল, চেয়ার, ছবি, অশোক, বিষ্ণু, কার্পেট—সব, সব যেন চেপে ধরছে পুলিনকে। আমি ভয় পাচ্ছি কেন, দৃঢ় হতে চেষ্টা করল। তাকাল রত্নার দিকে। রত্নার মুখ হাসি-হাসি। রত্না অমন হাসছে কেন? এতে হাসির কি হল?

অশোককে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে কেউ জানতে পারে নি তো?'

'তা তোর জানার দরকার কি ?'

অশোক তাকাল রত্নার দিকে। পুলিন দেখল, রত্না তির্যকভাবে তাকাল অশোকের দিকে। রত্নার তাকানোর ভঙ্গি ওই রকম। কিন্তু এখন দৃষ্টিটা বিশ্রী ঠেকল পুলিনের কাছে। এমন জোর করে স্মার্ট হবার দরকার কি... কি এমন হল যে···

এমন সময় রেজিস্ট্রার ঘরে ঢুকলেন। চোখে চশমা, গায়ে কালোকোট। বেশ সৌম্য, শান্ত।

'বসুন, বসুন।'

অশোক রত্নার দিকে এগিয়ে গেল। রত্না উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে এবং ইচ্ছে করেই যেন মুখের হাসিটা বজায় রেখে (পুলিনের মনে হল) এগিয়ে গেল টেবিলের সামনে। পুলিনের শরীর রি রি করে উঠল রত্নার আচরণে। এ কি অসভ্যতা !

'আয়, এখানে বোস্।'

পুলিন, রত্না বসল ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সামনে টেবিলের উল্টো দিকে। রেজিস্ট্রার ডানহাতি ড্রয়ার টানলেন। একটা ফাইল বের করলেন। ফাইল খুলে কয়েকটা কাগজ উলটে বললেন, 'রত্না মুখোপাধ্যায়, পুলিন মিত্র ?' অশোক দাঁড়িয়েছিল রেজিস্ট্রারের পাশ ঘেঁষে, 'হ্যাঁ—এরা দুজন।' রেজিস্ট্রার দেখলেন। কাগজ সামনে ধরলেন, 'দুজনেই সই করবেন।'

সই করল পুলিন, রত্না। তারপর এগিয়ে দিল কাগজ। রেজিস্ট্রার অশোকের দিকে তাকালেন, 'এবার উইট্‌নেসের ঘরে আপনারা—'

পুলিন দেখল, রেজিস্ট্রার একটা খাতায় কি যেন লিখছেন। আশ্চর্য! আমরা এখন···। রত্নার দিকে তাকাল। রত্নার মুখ অস্বাভাবিক লাল। কানের লতি কাঁপছে মৃদু মৃদু। সমস্ত মুখ থরথর করছে। এত আনন্দ রত্নার অথচ আমার। আমি যে কিছুতেই—

'আচ্ছা। এবার দুজনে একটু উঠে দাঁড়ান।'

রেজিস্ট্রার আদেশ করলেন যেন। দুজনে উঠে দাঁড়াল।

'হাত ধরুন।'

হাত ধরল দুজন। রত্নার হাত ধরতেই অবাক হয়ে গেল পুলিন। কেমন ঠাণ্ডা, অনুভূতিহীন। এই কি সেই রত্না, যাকে আমি···

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পুলিন।

'বলুন, ঈশ্বরের একান্ত নির্দেশে—'

রেজিস্ট্রার বলে চললেন, পুলিন অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। এই মেয়েটি আমার গৃহিণী। এতক্ষণ যে ···যে মেয়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছি আমি। অশোক, বিষ্ণু—সবাই পঞ্চমুখ অথচ আমি···পারবে সংসারে মানিয়ে নিতে নিজেকে। বাবা, মা, ভাই···

পুলিন ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ল। চোখ বেয়ে জল পড়বে যেন। রত্না ঠায় তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুতুল। বাবা যখন ওকে···পারবে মা-র মতো কষ্ট করে সবাইকে আপন করে নিতে ? পারবে বড়দি, মেজদির···

'থ্যাঙ্ক ইউ। সুখী জীবন কামনা করি।'

রেজিস্ট্রার নিয়মমতো শপথ গ্রহণ শেষ করালেন। তারপর নিষ্ক্রান্ত হলেন ঘর থেকে।

রাস্তায় নেমে অশোক বলল, 'তাহলে ফেস্টিভ্যালটা রেস্টুরেন্টেই হোক।'

বিষ্ণু লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই। থ্রি চিয়ার্স ফর—'

পুলিনের লজ্জা করতে লাগল। ও একবার রত্নার দিকে তাকাল।

'চল্। তাহলে আর দেরি নয়।'

এবং দ্বিরুক্তি না করে এগিয়ে এল ধর্মতলার দিকে।

'কেবিনে বসা যাক।' বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করে অশোক রত্নার দিকে চাইল, 'কি বল দেবী ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই অশোক কেবিনে ঢুকল। তারপর ঢুকল রত্না, তারপর বিষ্ণু—সবশেষে পুলিন।

'পর্দাটা টেনে দে পুলি।'

পুলিন উঠতে গেল, তার আগেই একটি ছেলে ঢুকল কেবিনে।

'কি খাবে রত্না ?'

রত্না একটু চুপ থেকে বলল, 'তোমরা কি খাবে ?'

'তুমি কি খাবে বল।'

'চা।'

'শুধু চা !'

রত্না কথা বলল না। মাথা নাড়াল।

'তবে আমরাও চা খাব।'

'কেন ? তোমরা খাও না, আমার খেতে ভালো লাগছে না।'

পুলিনের চোখে চোখ মিলতেই থেমে গেল রত্না।

'চারটে চা ঝট করে নিয়ে আয়।'

ছেলেটা চলে গেল পর্দা টেনে।

'কি দেবী, কেমন লাগছে?' অশোকের প্রশ্ন।

'কেমন আবার যেমন সবার।' রত্না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

পুলিন দেখতে পেল, রত্না কারণে-অকারণে হেসে উঠছে। ভারি বিশ্রী লাগছে পুলিনের। এত হাসির কি আছে? অশোকটাই বা হাসছে কেন? নাকি হাসি দিয়ে ঢাকছে নীলার বেদনা?

'কি রে? অমন করে কি দেখছিস?'

পুলিন চুপ।

বিষ্ণু ফুট কাটল, 'কি আর ভাবতে পারে,' বলে রত্নার দিকে তাকাল বিষ্ণু।

'আঃ বিষ্ণুদা, তুমি মানে—'

বিষ্ণুর ইঙ্গিতের চাইতে রত্নার ওই ভঙ্গি সারা শরীরে উত্তেজনা সৃষ্টি করল পুলিনের। অশোক জোরে হেসে উঠল। পুলিন সঙ্কুচিত হতে থাকল। রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে কেমন একটা···আর রত্নাটা এমন করছে, এমন হাসছে যে···

'এমন বোকার মতো করছিস যে,' বিষ্ণু বলে উঠল।

পুলিন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, বেয়ারা ঢুকল ঘরে।

ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাপগুলো রাখল। পুলিন দেখল, ঠিক একই রকম ভাবে চারটে কাপ নামাল ছেলেটা, বেরিয়ে গেল ঠিক একইভাবে।

চায়ে দীর্ঘ চুমুক দিল পুলিন, 'মোস্ট বাজে'—

'তা তো লাগবেই, এখন মন পড়ে আছে অন্যদিকে। চা খেতে কি···'

'রত্না তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো। মাসিমা বলেছেন নটার মধ্যে।'

বাধ্য শিশুর মতো সম্মতি জানাল রত্না। রত্নার ভঙ্গিগুলো ক্রমেই অস্থির করে তুলছে পুলিনকে। এই হাসছে, আবার এই বিষ্ণু, অশোকের কথা পুতুলের মতো মেনে নিচ্ছে। আশ্চর্য! চায়ে মন দিল পুলিন। সবাই চুপ।

আমি কি অবিচার করছি, পুলিন মনে মনে সমালোচনা শুরু করল। বিষ্ণু, অশোক এদের সামনে যদি···কিন্তু ওর ভয় করছে না? বাড়ি থেকে পালিয়ে এল, অথচ···

'চল্, ওঠা যাক।'

আবার রাস্তা। রাস্তায় নেমেই অশোক ঘোষণা করল, 'এবার কপোত-কপোতী তোমরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর।'

'তোরা?' পুলিন অসহায়ের মতো প্রশ্ন করল।

'আমরা এখন কাফিহাউসে যাব?'

'আমিও চলি না কেন তোদের সঙ্গে?'

'থাক্! কথায় কথায় সময় বয়ে যাচ্ছে। তোরা যা, ময়দানের শীতে একটু—'

বিষ্ণু অশোকের হাত টানল, 'আহ্, কি হচ্ছে। আমরা যাই, কি বল রত্না?'

'চল না এক সঙ্গে।'

রত্নার কথা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বিষ্ণু বলল, 'কিস্সু দরকার নেই। শেষে অভিশাপ কুড়োব আমরা···ওরে বাস্।' বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করল দুজন।

'এই অশোক, এই বিষ্ণু,' পুলিন ডাকল। ও কিছুতেই রত্নার সঙ্গে একলা থাকতে চাইছে না। কেমন ভয় করছে। রত্নাকে কিছুতেই আগের মতো মেনে নিতে পারছে না।

'থাক্। ন্যাকামি করিসে নে,' হাঁটতে হাঁটতে বিষ্ণু বলল।

অশোক একটু দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে এল কাছে, 'আমি তোদের বড়। আশীর্বাদ করি তোরা সুখী হ।'

পুলিন দেখতে পেল অশোকের চোখ চিকচিক করে উঠল। তবে কি নীলার দুঃখ ভুলতে পারে নি অশোক? পুলিনের বুক মোচড় দিয়ে উঠল। হাত বাড়াল, বিষ্ণু ততক্ষণ এগিয়ে গেছে। পুলিন দেখল, অশোক হাঁটছে, বিষ্ণুও। আরও···আরও লোক।

দৃষ্টি ফেরত এল, পাশে রত্না। অগণিত জনস্রোত, ট্রাম, বাস। শব্দ, শব্দ, আর আলো।

রত্না পুলিনের দিকে তাকাল। পুলিন কোনো কথা বলল না।

'ওদের যেতে দিলে কেন?' রত্না একটু হালকা হতে চাইল।

পুলিন তীক্ষ্ণভাবে তাকাল রত্নার দিকে। নিমেষে রত্না ছাই হয়ে গেল। পুলিন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। নিঃশব্দে এগুতে থাকল ধর্মতলা বেয়ে।

রত্না পুলিন পাশাপাশি হাঁটছে। অথচ দুজনে যেন দুজনের চেনা নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত। রত্না মুখ নিচু করে চলছে। পুলিন এ-ধার ও-ধার তাকাচ্ছে, কখনও বা রত্নার দিকে।

রত্না এমনভাবে হাঁটছে কেন? ও কি পারবে আমাদের সংসারের ভার নিতে? মা-বাবাকে পারবে সন্তুষ্ট করতে? নিজের বাবা-মাকে ভালোবাসে অথচ তাঁদের না জানিয়ে বিয়ে করার সময়···নাকি ভুল করেছে আমাকে বিয়ে করে?

রত্নার দিকে তাকাল আবার। জড়োসড়ো হয়ে হাঁটছে। অবাক হচ্ছে পুলিন। বিষ্ণু, অশোক থাকলে ভালো হত। এমন একটা···

বরফ ভাঙল পুলিন, 'কি? কথা বলছ না যে?'

রত্না তাকাল, উত্তর দিল না।

'মনে হচ্ছে, খুব ঠকে গেছ।'

রত্না চমকাল। পুলিন তার চমক দেখতে পেল। আবার চুপ।

'এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে বিয়ে হলে বোধকরি,' ঠাট্টা করতে চাইল। রত্না চুপ। রত্না যত নিশ্চুপ, পুলিন ততই অধীর। এমন চুপচাপ করে হাঁটছে—বিষ্ণু, অশোক-টা আচ্ছা কায়দা করল দেখছি।

'কি? কথা বলছো না যে।'

'কি বলব?' পুলিন দেখল, রত্না একটা দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের মনে একরাশ বিছে নড়ে চড়ে উঠল।

'আজ কি কোন কথা নেই তোমার? সব শেষ হয়ে গেছে?'

রত্না চুপ। পুলিনের সহ্য এবার সীমা অতিক্রম করবে।

'রত্না, আমার স্ত্রী। ভালোবেসে বিয়ে করেছি। ভালোবাসা। রত্নার সঙ্গে শুধু···ছি, ছি। এ কি ভাবছি। রত্না যদি ভালোই না বাসে, তবে···

একটু শান্ত হল পুলিন, 'শীত করছে নাকি?'

রত্নার স্বর বেরুতে চায় না। কোনমতে বলল, 'না।'

'আচ্ছা রত্না, তুমি কি ভাবো···' বলতে বলতে থেমে গেল। আজ এ মুহূর্তে ওসব কথা বলা উচিত হবে না। এই শুভদিনে···একেই শুভদিন বলে? সারাদিন ধরে, আজ এতদিন যার প্রতীক্ষা করলাম সে যখন এলো···নাকি ফাঁকি দিয়েছি? ফাঁকি!

তাকাল রত্নার দিকে। রত্না হাঁটছে নিঃশব্দে।

এতদিন রত্না আকর্ষণ করেছে চুম্বকের মত। ওর কথায় উঠেছি, বসেছি। কিন্তু আজ!

রত্নার ব্যক্তিত্ব আছে? বিষ্ণু একটা পাঠা। বিষ্ণুর মতো ছেলে···সবাই

আমাকে ভুলিয়েছে? ব্যক্তিত্ব? কোথায় ব্যক্তিত্ব? একটা জড়, মাংস পিণ্ড। আজ দুবছর ওকে ভালোবাসলাম···সেই···

পুলিন মনে মনে উত্তেজিত হতে লাগল।

এত কাছে এসেছে বলেই কি···। কাছে এলে প্রেম উপে যায়?

'এতো কি ভাবছ?' রত্না প্রশ্ন করল।

পুলিন নিমেষে জল হয়ে গেল। রত্নার চোখ ছল ছল। পুলিনের বুক গুমরে উঠল, ওই তো রত্না···রত্না···

তবু নিজেকে সংযত করে বলল, 'না, কিছু না।' রত্না এগুতে থাকল।

'আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হও নি?'

একটা তীক্ষ্ণ আঁচড় রত্নার প্রশ্নে। এ কি প্রশ্ন? এতক্ষণ এই প্রশ্নের জন্য আকুল হয়েছিল পুলিন। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। সুখী হয়েছি, সুখী হয়েছি—কিন্তু রত্নার দিকে তাকিয়ে বলতে পারল না।

রত্নার সে-জোর কোথায়? পুলিন আবার বলতে চেষ্টা করল, হাসতে চাইল। বৃথা! পারল না।

না, না তুমি সুখী হও নি।

যাকে চেয়েছি তাকেই তো—

ভুল।

কেন? কেন এই ছলনা—আমি রত্নাকে—

হাত বাড়াতে গেল পুলিন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিল। কেন? কেন বলব? রত্না জোর করে আদায় করতে পারে না? আর, সব কথা বলব কেন? সব কথা বলা যায়?

স্ত্রীকে? স্ত্রী! কে স্ত্রী? রত্না। বাবা-মাকে যে ফাঁকি দিয়েছে সে যদি আমাকে—

ভাবতে ভাবতে থমকে গেল পুলিন। দাঁড়িয়ে পড়ল।

'থামলে যে? আর্মিনিয়া যাবে?'

'কেন?' একটু এগিয়ে বলল পুলিন।

'কিছু খেলে না, তাই—' রত্না ম্লান হাসল।

'তাই ওখানে যেতে হবে।' রূঢ় কণ্ঠ পুলিনের।

রত্না নিরুত্তরে এগুতে থাকল।

মেট্রো ছাড়িয়ে আবার রত্না মুখ খুলল, 'ময়দানে বসবে?'

'ময়দান। আচ্ছা চলো।'

কিন্তু ময়দানে বসতে কিছুতেই মন চাইছে না। রত্না প্রস্তাব দিল বলেই কি…। অথচ পরশু দিন, থমকে যাচ্ছে পুলিন। আমিনিয়া থেকে খেয়ে গেলাম ময়দানে। কত জল্পনা, কল্পনা—অথচ আজ এখন, জীবনের সমস্ত বাস্তবতা ধাওয়া করে এসেছে। আহ্, জীবন।

জল্পনা, কল্পনা! মনে মনে হাসল পুলিন, রত্না চাইছিল না, আমিই ওকে… প্রিয়া স্ত্রী হলে এমন বদলে যায়, নাকি আমি…। বিষ্ণু, অশোক বাড়ি পৌঁছে গেছে।

পুলিন থামল রাস্তা পেরুবার জন্যে। রাস্তা পেরিয়ে ময়দান মুখো হলো। পা-পা এগিয়ে এল মনুমেণ্টের দিকে। তারপর চলতে লাগল ময়দানের মধ্য দিয়ে।

নিঃশব্দ দুজন—নির্বাক।

শীত। চারপাশে কুয়াশার পাতলা আস্তরণ। আলো…গাছ…স্তব্ধ, ঝাপসা, কুহেলীময়। শীত। পুলিন বসে পড়ল। রত্না বসল পাশে, কাছেই।

সামনে, দূরে—আলো। নিবে-আসা দ্যুতি। সবুজ, লাল, নীল—ফ্যান …কেৎলি…চা। কুয়াশার চাদরে অস্পষ্ট, আবছা। একটা রেখা। কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। ঋজু। মানুষটার চোখ দেখা গেল না। চলে গেল—মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ।

রত্না মুখ গুঁজে বসে আছে। পুলিন তাকিয়ে আছে। চোখ বিঁধিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। পায়ের শব্দ দ্রুত এগিয়ে এসে মিলিয়ে গেল।

নিঃশব্দ পুলিন, নিস্তব্ধ রত্না।

মনুমেণ্ট ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, কালো-লম্বা-দাঁড়ি-চিহ্নের মতো। ওখানে একটা ছেদ। জোরালো আলো ছুটে আসছে। ভিজে ভিজে কুয়াশায়—ভিজিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। আলোটা কালো হয়ে গেল। আর ধীরে ধীরে উঠে আসছে শব্দ। সাঁই…সাঁই…। এগিয়ে আসছে শব্দটা। একটা, তারপর একটা…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ…ঢঙ।

রত্না, পুলিন চুপ। সময় বয়ে চলল—চুপ।

কাছে, দূরে যেখানে চোখ পড়ছে, না-পড়ছে সেইখানেই আলো আর

আলো, কুয়াশা আর কুয়াশা। দুটি রেখা…চা…প…স্বরগুলো মিলে যাচ্ছে… মিশে যাচ্ছে কুয়াশায়।

ছুটো মোটা রেখা…। গন্ধ…শব্দ নয়। শুধু গন্ধ। ছড়িয়ে গেল' আর দু-চারজন…। তুমি…চিনে…ক্র্যাশ…ভাঙা ভাঙা শব্দ। একটা বিরাট শব্দ। মোটর ব্রেক কষেছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটল চৌরঙ্গীতে।

কেঁপে কেঁপে উঠল মানুষের মন, মানুষের শরীর। কলকাতার আকাশে তারা নেই। তারা অকম্পিত। গাছপালা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমন্ত, অবোধ শিশু। কুয়াশারা ঘিরে ধরেছে গাছপালা, রত্না, পুলিন, মনুমেণ্টকে—।

নিশ্চুপ দুজন। নির্বাক।

মনুমেণ্ট অকম্পিত। আলোর ছুটোছুটি—স্টেডিয়ামের মস্ত মস্ত খাঁচা। ঢঙ…ঢঙ। পোঁ-পোঁ। মানুষ। ট্রাম-বাস। শব্দ। আলো। গান। ময়দান। মনুমেণ্ট। রত্না। পুলিন। কুয়াশা—

হা-হা করে উঠল চারধার। একটা বেদনার জন্ম। চোখের সামনে, চোখের বাইরে—ডান পাশ, বাঁ-পাশ—সব পাশে কুয়াশা। কুয়াশা জড়াতে থাকল মানুষ-জন, মাঠ-ঘাট, গাছপালা—ট্রাম-বাস। জড়াতে থাকল আলো। লাল, হলুদ, শীত, ঠাণ্ডা—হিম-হিম।

শব্দ উঠছে। আরও আরও শব্দ।

নিঃশব্দ দুজন। রত্না আর পুলিন।

রত্না উঠে পড়ল। পুলিন দেখল রত্না ঝুঁকে পড়েছে। ঘড়ি দেখছে। উঠে দাঁড়াল।

তারপর হাঁটতে থাকল দুজন পাশাপাশি।

কুয়াশারা এবার শরীর নিয়ে খেলা করতে লাগল। চোখ, বুক, মুখ, পা —সমস্ত শরীরে কুয়াশার স্পর্শ। নিঃশব্দ, নিশ্চুপ। দূরে, কাছে আলো— সবদিকে শব্দ।

পুলিন, রত্না হাঁটতে থাকল—চুপ। শুধু ঘাসে চটিতে শব্দ উঠল, শপ শপ।

পুলিন, রত্না হাঁটতেই থাকল। যত এগিয়ে আসছে চৌরঙ্গী—আলো, শব্দ, ব্যস্ততা—ততই চুপ, আরও চুপ ওরা দুজন পাশাপাশি এগিয়ে আসতে লাগল।

কেউ কারুর দিকে তাকাল না, একটা কথাও বলল না। শুধু এগিয়ে আসতে লাগল আলোর মধ্যে, শব্দের মধ্যে—ব্যস্ততার মধ্যে।

কোন্ পথে?

কর্নেলি জেলিন্স্কি

[বিষয়টি সোভিয়েত দেশে আলোচিত হলেও সকল দেশেরই। আধুনিক সভ্যতারই এই জিজ্ঞাসা। টেকনোলজির বিপ্লবে সমাজতন্ত্রী দেশে জিজ্ঞাসাটা নতুন করে জেগেছে—পৃথিবীতে কারুবিদ্যার বিজয়ের অর্থ কি সুকুমার কলানুশীলনের অবসান? নতুন সমাজে কি ভাবে প্রশ্নটা আলোচিত হচ্ছে তার আভাস বহন করছে এই রুশ লেখার অনুবাদটি।
—পরিচয় সম্পাদক]

কোন্ পথে? বিজ্ঞানের পথ, না কবিতার পথ? এই প্রশ্নটা হঠাৎ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আর কাব্যিক ভাবধারার মধ্যে তীব্র বিরোধের ব্যাখ্যা করা যায় কী ভাবে? এই প্রশ্নের গুরুত্ব আজ আরও বেশি করে সোভিয়েত দেশে; যে-দেশ এক সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুতবেগে। পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা এই বিতর্ক সম্পর্কে অসংখ্য চিঠিপত্র পাচ্ছেন। বিতর্কের বিষয়: "ইলিয়া এরেনবুর্গ, না পলেতায়েফ?" এই বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন বহু শ্রমিক, বহু ইঞ্জিনীয়ার, বহু ছাত্রছাত্রী।

ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফ জোর গলায় জানিয়েছেন: "কথাটা শুনতে আমাদের ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, মানতেই হবে যে, আমাদের মনের উপর কবিদের প্রভাব কমে আসছে, তাঁদের কাছ থেকে আমাদের শিখবার মতো বিশেষ কিছু নেই। আবেগের সৃষ্টির দ্বারা বিমোহিত হলে আমাদের চলবে না—আমাদের চলতে হবে মননের সৃষ্টির দ্বারা, তত্ত্ব ও তথ্যের কবিত্বের দ্বারা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিজস্ব সৌন্দর্যের দ্বারা। এ যুগের ধর্মই এই।"

বক্তা যুবক। তাঁর এই উক্তিকে আজকের দিনের বহু যুবকেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি বলে ধরে নেওয়া যায়। বস্তুত বিতর্কের আসরে আরো অনেকে ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফকে সমর্থন করেছেন।

বিপক্ষ ইলিয়া এরেনবুর্গ পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, "পলেতায়েফ যা বলেছেন তা একটা স্বল্পস্থায়ী ব্যাধিরই লক্ষণ। বলা যায় এ এক সাময়িক সর্দি জ্বর।"

শিল্পকলার পক্ষ নিয়ে এরেনবুর্গ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতি অন্ধ, উদগ্র ভক্তির বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের পূজা আর শিল্পকলার প্রতি কালাপাহাড়ী অবজ্ঞাকে তিনি যখন সামান্য একটা সর্দি জ্বরের স্তরে নামিয়ে এনে সমস্যাটা জলের মত সহজ করে দিতে চেয়েছেন, তখন তাঁর সেই বক্তব্যে সায় দিতে পারি নি। সমস্যাটা এত সরল নয়। সর্দির মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার বিষয় মনে করলে ভুল হবে। সমগ্র প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমাজগত ও তত্ত্বগত প্রশ্ন। আজ আমাদের চারদিকে দেখছি বিজ্ঞানের প্রতি প্রবল, অদম্য আকর্ষণ। ব্যাপকভাবেই চোখে পড়ে এক যন্ত্রবিজ্ঞানগত মনস্তত্ত্ব।

এই সত্য প্রথমে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তারপর চলুক তার মূল্যবিচার, চলুক চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ। আদপে এ সর্দি জ্বর নয়। বরং বলতে পারি এ যেন এক জলন্ত দেশলাই এক রাজ্যের খড়কুটোর মধ্যে। জানতে হবে কী উপাদানে গঠিত এই খড়কুটো যার জন্যে তারা এমনতর দাহ্যমান। ভাবতে হবে কেন এই নতুন মনস্তত্ত্ব এত ব্যাপক, এত প্রবল হয়ে চলেছে। আসল জবাব খুঁজতে হবে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বাস্তব স্ববিরোধের মধ্যে, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসম বা বিষম বিকাশের মধ্যে, বিশেষ করে আবেগজাত ও অনুভূতিগত সমস্যাগুলির মধ্যে।

কথাটা অনেকেরই ভালো না লাগতে পারে, তবু এ সত্য থেকেই যাচ্ছে যে, বর্তমান কালে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি মাত্র বিভাগ—গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান—আর সকল বিভাগকে কমবেশি নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। পি. আন্তোকল্স্কি তাঁর "কাব্য ও পদার্থবিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধে আক্ষেপ করে বলেছেন: এই সমস্যা নিয়ে অনেকেই আজ মাথা ঘামাচ্ছেন, রীতিমতো উদ্বেগ বোধ করছেন। অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, সব চেয়ে বেশি দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে পদার্থ বিজ্ঞানের উপর—কেবল পদার্থ বিজ্ঞানই নয়, সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর। সুনাম আর সম্মান লাভের জন্যে অসম্ভব ভিড় জমেছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কাব্য, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্র তুলনায় অনাদৃত। কারো দ্বিতীয় স্থান, কারো তৃতীয় স্থান। প্রথম স্থান বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন শাখার একচেটে অধিকারে।

অবশ্য সোভিয়েত দেশে কবিতা উচ্চ সম্মানের স্থান পেয়েছে। তাই বলে কাব্য এখনো এমন দেশজোড়া বা রাষ্ট্রজোড়া গুরুত্ব লাভ করে নি যাতে করে

তা লোহা আর ইস্পাতের উৎপাদনের মতো পার্টি কংগ্রেস বা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জরুরি আলোচনার বিষয় হতে পারে।

তবে কবিরা এই কথা জেনে অনেকটা সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, কবি আর নাট্যকারের চেয়ে অনেক বেশি কম স্বীকৃতি পান সমালোচকের দল। সোভিয়েত এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায় বা সোভিয়েত বিশ্বকোষে সাহিত্য ও শিল্পকলার জন্যে বেশি জায়গা পাওয়া না গেলেও ওরই মধ্যে যা হক করে বহু লেখকের নামধাম দেওয়া গেছে। সোভিয়েত দেশের শত শত সমালোচকের একজনেরও সম্পর্কে একটি লাইনও খুঁজে পাবেন না। সোভিয়েত বিশ্বকোষের সম্পাদকমণ্ডলীর রসজ্ঞান একেবারেই নেই একথা ঠিক নয়।···

বি. তোমাশেভ্‌স্কি গণিতশাস্ত্র নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন। লেনিনগ্রাদে গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বিস্তর লেক্‌চারও দিয়েছেন। এ-হেন ব্যক্তিকে একদিন প্রশ্ন করে বসলাম: বিশুদ্ধ গণিত চর্চার আনন্দের পথ ছেড়ে হঠাৎ আপনি কবিতা নিয়ে মেতে উঠলেন কেন, ভাষাতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়লেন কেন?

মৃদু হেসে আমার এই প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি বাবাতিনস্কির কবিতার ছুটো লাইন আবৃত্তি করে। ভাবার্থ এই: জীবন যাতে নিরানন্দ হয়ে না পড়ে তারই জন্যে এ রকম পালা-বদলের প্রয়োজন।···

এবার আর একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক—বৃত্তি বা পেশার প্রশ্ন। আমাদের যুগ চায় গণিতশাস্ত্রী, চায় বিজ্ঞানীর দল। ভালো কথা। কিন্তু কেউ যদি কবি হয়ে জন্মান কিংবা ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের দিকে একটা সহজ আকর্ষণ যদি কারো থাকে, তা হলে? মুশকিল এইখানে। এই সমস্যা নিয়ে একখানি সংবাদপত্র এক বিতর্কের আসর খুলেছিল। আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামাটি ছিল সুন্দর: "মানুষ যা সব চেয়ে বেশি ভালবাসে সেই ক্ষেত্রে সে দৈত্যের মতো বিরাট।" তা হলে এ কথা মেনে নিতে হয় যে, যা ভালো লাগে না সে কাজে লেগে থাকতে হলে মানুষ বিরাট হতে পারে না। তা হলেই প্রশ্ন দাঁড়ায়: কোন্ পথে? কোন্ দিকে? শ্রমের, জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ শাখায়?

বাইরের বাধা বড় বড় প্রতিভার ক্ষেত্রে হয় তো অনতিক্রম্য নয়। প্রতিভা তার নিজের তেজে পথ তৈরি করে এগিয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকে আর্কএঞ্জেল্‌স্ক-এর পাড়াগাঁয়ের ছেলে লোমনসফ কত বাধা ঠেলে সরিয়ে একদিন পণ্ডিত হিসেবে জগৎজোড়া খ্যাতি আদায় করে নেন। অনগ্রসর রিয়াসান জেলার এক বালক উত্তর কালে সমকালীন বহু শক্তিশালী কবির খ্যাতি ম্লান করে দিয়ে একদিন কবি-সার্বভৌম হলেন। কবি ইয়েসেন সম্পর্কে গর্কি মন্তব্য করেছেন: তিনি মানুষ ছিলেন না—ছিলেন কেবল কবিতারই জন্যে বিশেষভাবে তৈরি একটা অর্গেন বাদ্যযন্ত্র। প্রতিভার ক্ষেত্রে স্বধর্ম বা আপন বৃত্তির শক্তি এমন অদম্য, অপরাজেয় হতে পারে।

কিন্তু মানুষের অগ্রগমনের পথ কেবল প্রতিভাবান লোকেরাই তৈরি করে দেন এ-কথা ঠিক নয়। অগ্রগতির পথ রচনায় অসংখ্য সাধারণ মানুষেরও প্রভূত দানঅবদান থাকে। অধিকাংশ মানুষেরই জীবন-কাহিনী লেখে তাদের কাল, সেই কালের সমাজ-ব্যবস্থা, সেই যুগের দাবি—এক কথায়, বহিস্থ শক্তি, আভ্যন্তরীণ শক্তি নয়। এই বাইরের "কণ্ঠস্বরই" বহু ক্ষেত্রে মানুষের সৃজনী শক্তির প্রকাশে-বিকাশে তার নিজের চেয়েও অধিকতর ও সঠিকতর নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।···

দেখা গেছে বড় বড় পদার্থবিজ্ঞানীদের অনেকে রম্য রচনার ভক্ত। এঁদের মধ্যে অনেকের আবার এমন ধারণাও আছে যে, "বাইরের শক্তিগুলি" তাঁদের ভিন্ন পথে স্থাপন না করলে তাঁরা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের সেবক হতে পারতেন।

আমাদের ইঞ্জিনীয়ার পলেতায়েফ কবি ও কবিতা সম্পর্কে অমন উগ্রভাবে বিরূপ হলে কী হবে, স্বয়ং আলবার্ট আইনস্টাইন কাব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সব চেয়ে বেশি। আইনস্টাইনের সহকর্মী এ. মশকোভস্কি লিখেছেন:

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। অত বড় একজন বিজ্ঞানী কিনা বললেন: বিজ্ঞানকে তিনি সব চেয়ে বড় আনন্দের উৎস বলে মনে করেন না।

"আইনস্টাইন স্পষ্টই বললেন: ব্যক্তিগতভাবে আমি শিল্প-সাহিত্য থেকেই বেশি আনন্দ পাই। সব চেয়ে বেশি আত্মিক পরিতৃপ্তি পাই শিল্প-সাহিত্যেই, আর কোনো ক্ষেত্রে নয়।···বর্তমানে আমি কাব্য নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছি।

"সাধারণভাবে কাব্য, না বিশেষ কোনো কবির কবিতা?"

"সামগ্রিক কাব্যের কথাই ভাবছি। এখন আমায় সব চেয়ে কে বেশি আকর্ষণ করছেন এ প্রশ্ন যদি করেন, তবে বলব: দস্তয়েভ্স্কি।"

"তিনি বার বার দস্তয়েভ্স্কির নামোচ্চারণ করলেন। আমাকে আপত্তি জানাবার সুযোগও দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন: দস্তয়েভ্স্কির কাছ থেকে আমি যা পাই অতখানি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনো মনীষীর কাছ থেকেই পাই নি।"

আইনস্টাইন আর মশকোভস্কি এ দুজনেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে, দস্তয়েভ্স্কি কেবল "দি ডাব্‌ল" আর "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট" গ্রন্থের লেখকই ছিলেন না, তিনি একজন মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারও ছিলেন—ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্রের একজন ছাত্র।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন জ্ঞানের উৎস হিসাবে জীবন ও জগতের আবেগগত ও সৌন্দর্যানুভূতিগত অভিজ্ঞাকে আদৌ অস্বীকার করে না। আইনস্টাইনও করেন নি। দার্শনিক কাণ্টের এই বিখ্যাত সূত্র তিনি মানেন নি: "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের পরিমাণ সেই ক্ষেত্রের গাণিতিক পরিমাণের সমান।" গ্যালিলিওর এই উক্তির সঙ্গেও তিনি একমত নন যে, "প্রকৃতির গ্রন্থ আমাদের সামনে উন্মুক্ত। এই গ্রন্থ লেখা হয়েছে বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে নয়—লেখা হয়েছে ত্রিভুজ, আয়ত ক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদি জ্যামিতিক অক্ষরের দ্বারা।" কথাগুলি শুনতে বেশ, কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি সায় দেয় না।

মানুষ আজ চাঁদের অপর পিঠের আলোকচিত্র তুলে এনেছে। মহাকাশের কাছ থেকে একটা রহস্যের যবনিকা ছিঁড়ে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে প্রকৃতি-জয়ের অভিযানের অভূত অগ্রগতির কল্যাণে। এ কথা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান, প্রথমত ও প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান আর গণিত, আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের মন টানছে একটা বিরাট চুম্বকের মতো। এ নিয়ে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ যদি কোথাও থাকে তো তা রয়েছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মধ্যে, বিজ্ঞানেরই অগ্রগতি সাধনের মধ্যে। আজ মুখ্য বিপ্লব চলছে সামাজিক ক্ষেত্রে, উৎপাদনগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চলেছে আর একটি বিপ্লব।

ভাবীকালের বিজ্ঞান সম্পর্কে একজন পণ্ডিতের ভাষায় বলা যায়: "মানুষের জয়যাত্রার পথে যথার্থ বাস্তব জ্ঞান যখন তার কাছে সর্বময় হয়ে উঠবে,

সেই দিন ভবিষ্যৎ তার সমস্ত সৌন্দর্য-সম্ভার নিয়ে ধরা দেবে মানবকল্যাণময়ী বিজ্ঞান লক্ষ্মীর কাছে। তখন বিজ্ঞানও ফিরে আসবে মানুষের কাছে, তার সৃজনাত্মক অনুভূতির কাছে। তখন সেই নতুন জগতের প্রবেশদ্বারে বিজ্ঞানের দানঅবদানগুলি সত্যই মহিমময় হয়ে উঠবে। সেদিন মানবিক সভা রূপান্তরিত হবে বৈজ্ঞানিক সভায়।"

এইভাবে, প্রতিটি চিন্তাক্ষম মানুষ হয়ে দাঁড়াবে বৈজ্ঞানিক মানুষ, হবে এক চিন্তাশীল মানুষ। কবিরা এই রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের নতুন সঙ্গীত নতুন সৌন্দর্যের অন্তরলোকে পাঠক সমাজের প্রবেশের ছাড়পত্র কবিদেরই হাতে। বিজ্ঞানের এই মহিমা, এই সৌন্দর্য এখনো অনেকেরই কাছে রহস্য হয়ে আছে। সেই রহস্যলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন কবি।···

মানব সমাজ এখন নব নব বিস্ময়কর আবিষ্কারের দ্বারদেশে। বিজ্ঞান আমাদের হাতে এনে দেবে জৈব ও অজৈব বস্তুর অভ্যন্তরস্থিত প্রক্রিয়ার সহিত নিবিড় পরিচয়ের স্বচ্ছ চশমা। কবি ও দার্শনিককে কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হলে চলবে না। ঐ জয়যাত্রার মিছিল যেন তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়।···

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক বিষয়। এই দুই শাস্ত্র নিজেরা যদিও কোনো ভোজবাজির প্রতিশ্রুতি কখনো দেয় না, তবু তাদের কাছে থেকে আমরা কত বিস্ময়কর জিনিস পেয়েছি। প্রকৃতি জয়ের ক্ষেত্রে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান যেন "চিচিং ফাঁক" বা গুপ্তদ্বার খোলার মন্ত্র, মহাশূন্যে অনুপ্রবেশেরও চাবিকাঠি বিজ্ঞানের এ দুইটি শাখার হাতে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রতি মানুষের মোহ স্বাভাবিকও বটে, সঙ্গতও বটে।

কিন্তু গণিতের সূক্ষ্ম প্রতীকচিহ্নগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, প্রকৃতি-বিজয়ে তার অপরিসীম দানঅবদানের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে গিয়ে আমরা যদি আমাদের জগতটাকে কেবল ডিফারেন্‌শিয়াল্ ক্যালকুলাস্ ও ইন্টিগ্রাল্ ক্যালকুলাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে রাখি তা হলে আমরা মস্ত বড় ভুল করব। তা হলে দর্শন, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র ও শিল্পকলার কী দশা দাঁড়াবে? সাম্যবাদ আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সবই চাই—মানুষের মধ্যে যা কিছু মানবিক তারই পূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশ চাই। এই কারণেই পলেতায়েফ ও তাঁর সমর্থকদের উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ইলিয়া এরেনবুর্গের হাতে হাত মেলাতে আমার আপত্তি নেই।

সভ্যতার একপেশে বা বিষম বিকাশের ফলে আমাদের এই যুগ মানুষের মনের পরদায় ভারসাম্যের অভাবের একটা ছায়া ফেলতে পারে এবং ফেলেও। আবার এই যুগেরই জোর দাবি: আমাদের লক্ষ্য হতে হবে এক সুস্বর সমন্বয়, এক সুসমঞ্জস ঐকতান। অধিকাংশ মানুষকেই, এমন কি যাঁরা গাণিতিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে মেতে আছেন তাঁদেরও, তাকাতে হয় গোটা মানুষের দিকে—মানুষের ভগ্নাংশের দিকে নয়। রাজনীতি, চন্দ্রলোক, সঙ্গীত, বসন্তের কোকিল, সূর্যাস্তের সোনালী সমারোহ, প্রেমবিহ্বল চোখের চাওয়ার অগাধ মাধুর্য—এ সবই অধিকাংশ মানুষের কাছে দু'য়ে দু'য়ে চার এই সূত্রের চেয়ে ঢের বড় গাণিতিক প্রমাণের কবিত্ব বা সৌন্দর্যের চেয়ে ঢের বেশি রমণীয়, বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বিজ্ঞানের অবদানও অধিকাংশ মানুষের কাছে রমণীয়, বাঞ্ছনীয় হতে পারে। সেই সম্ভাবনার যুগ আমাদের সামনে। চাঁদের বুকে গিয়ে পৌঁচেছে সোভিয়েত দেশের প্রতীকচিহ্নিত ফলক। মানুষের প্রতিভা কত অজানাকে জানছে, কত অচেনাকে চিনছে। ফলে জন্ম নিচ্ছে এক নূতন সৌন্দর্যশাস্ত্র, নূতন কান্তিবিদ্যা।

এইখানেই কবির ডাক পড়বে। কবিকে কেবল তাঁর চিরাচরিত কল্পনা আর সঞ্চার আশ্রয় নিলেই চলবে না। চাই নতুন দৃষ্টি, নতুন সম্বল। গণিত আর কাব্য আছে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে। জ্ঞান ও বোধের এই উভয় ক্ষেত্রকেই পরস্পরের কাছ থেকে নতুন আদবকায়দা শিখতে হবে, নিতে হবে নতুন ভাববস্তু।

এরেনবুর্গ ঠিকই বলেছেন। কবিতার মৃত্যু হবে এমন ভয় নেই। অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি এবং ঐক্য ও অনৈক্যের এমন সব সূক্ষ্ম দিক, সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা প্রবন্ধে বা উপন্যাসে ঠিক মতো প্রকাশ করা যায় না। তা প্রকাশ করা যায় কেবল কাব্যেই। কবি ও মনীষী গোটেও এই রকম অভিমতই ব্যক্ত করে গেছেন।

সাম্প্রতিক সাহিত্য

The First Indian War of Independence 1857-1959 by K. Marx and F. Engels. Foreign Languages Publishing House, Moscow. প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। এক টাকা দু আনা॥

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তন করে গেছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল, তার সংহারমূর্তি, "অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের যন্ত্ররূপে" তার বিপ্লবী ভূমিকা, ভারতকে "পুনরুৎপাদক দেশে" রূপান্তরিত করবার আয়োজন, আধুনিক শিল্পের প্রকৃত অগ্রদূত হিসাবে রেলপথের ভূমিকা, ভূমি-ব্যবস্থার স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে নূতন আলোকসম্পাত এবং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন মার্কসই করেছেন। পরিণত বয়সে রচিত (এবং তাঁর মৃত্যুর পরে এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত) ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে ভারতের অর্থনীতি প্রসঙ্গে মার্কস যে মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার যথার্থতা এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফলে স্বীকৃত। দীর্ঘকাল ভারত প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাবলী অপ্রকাশিত এবং অবজ্ঞাত ছিল। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনুসন্ধিৎসুরা (বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও যাঁরা মার্কস-কে অচ্ছুৎ এবং অপাংক্তেয় মনে করেন তাঁরা ছাড়া) ক্রমশ এই রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের ভারত সম্পর্কিত রচনাবলী প্রকাশের প্রধান কৃতিত্ব মস্কোর "ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস"-এর প্রাপ্য। আলোচ্য পুস্তিকাটি এঁরাই প্রকাশ করেছেন।

১৮৪৮ সনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পরে মার্কস ও এঙ্গেলস তৎকালীন নির্বাসিত বিপ্লবীদের চক্র থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং কালিফোর্নিয়ায় ইউরোপীয় পুঁজিবাদের নূতন প্রসারের তাৎপর্য

অনুধাবনের গবেষণায় নিবিষ্ট হন। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্ন উত্থাপিত হবার সময় নিউ ইয়র্কের "ডেইলী ট্রিবিউন" পত্রিকায় মার্কস ধারাবাহিক ভাবে ভারত সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধাবলী রচনা করতে থাকেন। চার বৎসর পরে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সুরু হলে, প্রধানতঃ সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মার্কস বিদ্রোহের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলে। সামরিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এঙ্গেলস সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে "ভারতে ব্রিটিশ ফৌজ", "লক্ষ্ণৌর পতন" প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। ঐতিহাসিক ঘটনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মার্কস-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর সম্ভবত "The class struggles in France, 1848-50" (১৮৫০ সনে প্রকাশিত) এবং "The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparti" (১৮৫১-৫২ সনে প্রকাশিত)। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রবন্ধমালা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস মহাবিদ্রোহের আলোচনা করেছেন। বিদ্রোহের বহু ও বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে তাঁদের দখল এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি শত বর্ষ পরেও অনুসন্ধিৎসুদের অনুপ্রাণিত করবে।

মহাবিদ্রোহ সুরু হবার কিছু পরে, ১৮৫৭ সনের ৩০শে জুন, মার্কস বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"There had been mutinies in the Indian army, but the present revolt is distinguished by characteristic and fatal features. It is the first time that Sepoy regiments have murdered their European officers; that Mussalmans and Hindus, renouncing their mutual antipathies, have combined against their common masters; that "disturbances beginning with the Hindus, have actually ended in placing on the throne of Delhi a Mohammedan Emperor"; that the mutiny has not been confined to a few localities." (পৃঃ ৪০)।

৩১শে জুলাই তিনি লিখলেন :

"By and by there will ooze out other facts able to convince even John Bull himself that what he considers a military is in truth a national revolt." (পৃঃ ৫৬)

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের দ্রুত প্রসারে লণ্ডনে ভীতি, স্টক এক্সচেঞ্জ-এর গতি, ব্রিটিশ পত্রিকায় বিদ্রোহ দমনে ছোটখাট সাফল্যের অতিরঞ্জন, ব্রিটিশ সৈনিকদের বর্বরতা এবং লুটতরাজ, বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ অফিসার এবং সৈনিকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদ্রোহের শেষ দৃশ্যে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ ("bitter dissensions among rebels") বিদ্রোহীদের ভ্রান্ত সামরিক কৌশল প্রভৃতির বর্ণনায় মার্কসের ঐতিহাসিক ঘটনার উপর দখল এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রকাশিত। সিপাহীদের "বর্বরতা" এবং "হত্যাকাণ্ড" সম্পর্কে ইউরোপের সংবাদপত্র জগৎ যখন সংশয়হীন, মার্কস তখন লিখেছিলেন :

"However infamous the conduct of the sepoys, it is only the reflex in a concentrated form, of England's own conduct in India.···There is something in human history like retribution." (পৃঃ ৯১)

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সাভারকর ছাড়া ভারতের প্রবীণ এবং "নিরপেক্ষ" ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে বিদ্রোহী সিপাহীদের কার্যকলাপের মূল্যায়নে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের একপেশে বক্তব্য হৃদয়হীনভাবে সমর্থন করেছেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের স্কুল-কলেজ পাঠ্য বইগুলির কথা অনেকের মনে পড়বে। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ফৌজদের নৃশংসতা সম্পর্কে মার্কস কিন্তু তিতিক্ষার মনোভাব দেখাতে পারেন নি। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত না হলে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ-এ ব্রিটিশ ফৌজের লুটতরাজ, গৃহদাহ, পাশবিক অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নীরব থাকা সম্ভব নয়।

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে এঙ্গেলসের ছয়টি প্রবন্ধ এই সংকলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রধানত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধগুলি রচিত। যতদূর জানি এঙ্গেলসের প্রবন্ধমালার প্রকাশ এই প্রথম। লক্ষ্ণৌ-র পতনের পরে বিদ্রোহীদের গঙ্গা অতিক্রম করে দোয়াব অঞ্চলে প্রবেশ, কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করবার প্রয়াস, জগদীশপুরে গভীর অরণ্যে অমর সিংহের গেরিলা যুদ্ধ, কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে অচল করে দেবার আয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতি প্রসঙ্গে মার্কসের কয়েকটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের

ছাত্ররা "British Incomes in India," "Lord Canning's Proclamation and Land Tenure in India", "Taxes in India"—এই প্রবন্ধগুলি থেকে নতুন আলোক ও তথ্য পাবেন। মহাবিদ্রোহের অর্থনৈতিক পটভূমি বুঝতেও এই প্রবন্ধগুলি সাহায্য করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের প্রবন্ধাবলীর মূল্য শত বর্ষ পরেও অম্লান আছে। দুঃখের কথা অনেক পণ্ডিত এই প্রবন্ধগুলি আদৌ পড়েন নি।

সুনীল সেন

ভ্রম সংশোধন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রবন্ধ পত্রিকা'র সমালোচনায় দুটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। ১০৫৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারার প্রথম পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে: তাছাড়া, প্রথম প্রকাশকাল থেকে নিছক প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা সম্ভবত এই প্রথম।

একই প্যারার শেষ পংক্তির শুদ্ধ পাঠ হবে: কিন্তু নিজের সাহিত্য স্থষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চায় তিনি স্বয়ং যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন না বলেই হয়তো তাঁর উত্তরসূরীরা প্রধানত গল্প-উপন্যাস লিখেই সন্তুষ্ট রইলেন।

'দুস্তর মরু' গ্রন্থটির সমালোচনায় একটি মুদ্রণ প্রমাদ আছে। ১০৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সমালোচনাটির দ্বিতীয় প্যারার শেষ পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে: সভ্যতার আদিপীঠভূমি সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির বাঁও কষাকষিতে বিষাক্ত হয়ে উঠল।

পুস্তক পরিচয়

আমেরিকায় শিশিরকুমার ॥ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। পরিবেষক: বুক এণ্ড বুক। পাঁচ টাকা॥

বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম নানাবিধ তাৎপর্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 'সীতা'র নাট্যকার হিসেবে তিনি শিশিরকুমারকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। অভিনয়ে যদিও তিনি ভাদুড়ী মহাশয়ের শিষ্য, তবু তাঁর নিজস্বতা শম্ভু মিত্রকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছে, 'বাংলাদেশের নতুন অভিনয়-পদ্ধতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক-পিতা'…। নাট্যশিক্ষক হিসেবেই বা তাঁকে কে অস্বীকার করবে?

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঐতিহাসিক। ভাদুড়ী মহাশয়ের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় নাট্যসম্প্রদায়ের আমেরিকা গমন এবং সেখানে সতু সেনের ত্রাণকর্তারূপে আকস্মিক আবির্ভাব পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগাভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে। সম্প্রতি যখন নাটক-অভিনয় ও প্রয়োগশিল্পের চর্চায় বাংলাদেশে নাট্যবিষয়ক নবজাগৃতির সূচনা দেখা দিয়েছে, তখন আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলা চলে।

১৯৩০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, ভাদুড়ী মহাশয় পরিচালিত 'নাট্যমন্দির-লিমিটেড-থিয়েটার'-এর এগারোজন অভিনেতা নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে খিদিরপুর বন্দর ত্যাগ করেন। এই দলে কোনো অভিনেত্রী এবং স্বয়ং ভাদুড়ী মহাশয় ছিলেন না। তাঁরা অন্য দলে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে জাহাজে নিউ ইয়র্ক পৌছতে মাস দেড়েক সময় লাগত। আমাদের দুর্ভাগ্য শিশিরবাবুর কোনো সঙ্গী যোগেশচন্দ্রের মতো জাহাজের ডায়েরী রাখেন নি। চৌধুরী মহাশয়ের দলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, তারাকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি ছিলেন।

১৯৩০ সাল ভারতবর্ষের জীবনে এক স্মরণীয় সময়। একদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ভ্রমণরত। পাশ্চাত্যের কাছে ভারতবর্ষ ক্রমশ এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে নিজের আসন করে নিচ্ছে।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ডায়েরীতে এই সময়ের এক সুন্দর চেহারা পাই। দেখতে পাই তাঁর প্রবল জাতীয়তাবোধ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা, দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, নতুন নাট্যআন্দোলন—তথা জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্গঠন এবং পাশ্চাত্যের কাছে আপন স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও পুব-পশ্চিম সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের মহৎ ব্রত। ভাদুড়ী মহাশয় ও 'নাট্যমন্দির-থিয়েটার-লিমিটেড'-এর আমেরিকা গমনের পরিপ্রেক্ষিত যোগেশচন্দ্রের মানসিকতার এই প্রতিফলনেই স্বতঃপ্রকাশিত।

সেই তিরিশ সালেই আমেরিকা তাঁদের মোহভঙ্গ করেছিল। তার প্রমাণ চৌধুরী মহাশয়ের ডায়েরীর দ্বিতীয়ার্ধ। এই দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের মনে কি নির্মম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তারও পরিচয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও অনভিনীত নাটিকা 'মাকিনীমার'। নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পথে এই তীব্র ব্যঙ্গ নাটিকাটি তিনি জাহাজেই রচনা করেছিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের রোজনামচার সঙ্গে নাটিকাটি প্রকাশ করে অরুণ চৌধুরী ও অশোক পালিত একাধারে গবেষকের নিষ্ঠা ও রসিকের সং রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্কে ভাদুড়ী মহাশয়ের দল যে লাঞ্ছনা, অনির্দেশ্যতা ও অর্থবিপাকে পড়েছিলেন—সেই অভিজ্ঞতা, তথা দেশের পরাধীনতার গ্লানি ও মাকিনী সভ্যতার ক্লেদ—দুইই এই নাটকে তীব্রভাবে পরিস্ফুট। নাটিকাটি এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও অনভিনীত থাকার কারণ আমাদের কাছে রহস্যের সৃষ্টি করেছে। সৌভাগ্যবশত চৌধুরী মহাশয় এটি ৩০ সালেই লিখেছিলেন এবং তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলেন না। স্মরণীয় যে, একই কালে রবীন্দ্রনাথও আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মর্মান্তিক প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন।

রোজনামচায় যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিমনের বিশেষ অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই রসিক নাট্যপুরুষের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয়

আমরা ইতিপূর্বে পাই নি। প্রসঙ্গত তাঁর দলের এবং আমেরিকার বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং সতু সেন মহাশয়ের আবির্ভাব, নানাবিধ বিপাকের মধ্যে শিশিরবাবুর নায়কোচিত দার্ঢ্য রোজনামচার দ্বিতীয়ার্ধকে সমৃদ্ধ করেছে।

রোজনামচার নায়ক যোগেশচন্দ্র স্বয়ং। তা সঙ্গতও হয়েছে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না 'মার্কিনীমার' নাটিকার নায়ক শিশিরবাবু। এইখানে তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও নাট্যরসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য শিশিরবাবুর মতো বাংলা নাট্যজগতের এক যুগান্তকারী পুরুষ সম্পর্কে বহু তথ্যই বিনষ্ট হয়েছে। সচেতনভাবে তা সংগ্রহ করে রাখার ব্যাপক চেষ্টাও কোনোদিন দেখা যায় নি। হেমেন্দ্র রায় ও হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয়ের গ্রন্থে ঐতিহাসিক আমেরিকাবাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আশানুরূপ তথ্য নেই। সেইদিক দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি শিশিরবাবুর অনুরাগী ও এতৎ-বিষয়ক গবেষকদের নানাভাবে সাহায্য করবে।

সুতরাং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও শিশিরকুমারকে এক বিশেষ পর্যায়ে বোঝার পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। মনে রাখা দরকার, আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শিশিরবাবু বাংলা রঙ্গমঞ্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পূর্ণ-ভাবে পালন করেন। সুতরাং বিদেশ-ভ্রমণ, বিদেশী নাটক অভিনয় ও প্রয়োগকৌশল নিশ্চয়ই ভাদুড়ী মহাশয়কে প্রভাবিত করে থাকবে। চৌধুরী মহাশয় তাঁর ডায়েরীতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত না করলেও বাংলা নাট্যজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে এই আমেরিকাগমন এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সম্পাদকদ্বয়ের লেখা গ্রন্থপরিচিতিটি সুলিখিত। পরিশিষ্টে যোগেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থতালিকা এবং যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে বাংলাদেশের সাহিত্য ও নাট্যজগতের কতিপয় বিশিষ্ট পুরুষের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এবং সর্বোপরি আমেরিকায় 'সীতা' অভিনয় সন্দর্শন করে সেই ৩০ সালে তদ্দেশীয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনার পুনর্মুদ্রণ এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে। সম্পাদকদ্বয় সত্যই বইটির সম্পাদনায় গভীর নিষ্ঠা ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোমুখি ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তক প্রকাশক। আড়াই টাকা ॥

এখানি শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম গল্পগ্রন্থ। মোট ছটি গল্প আছে, কিন্তু মুখোমুখি নামে কোনো গল্প নেই। অর্থাৎ মুখোমুখি শব্দটা এই গল্পগুলির থীমের পরিচয় দিচ্ছে। বই শুরু হবার আগে চার লাইনে লেখক বলেছেন, "আজকের এই জীবনের মুখোমুখি হচ্ছে, জীবনের মোকাবিলা করছে, জীবনের হাতে মার খাচ্ছে এমনই কয়েকটি যুবক-যুবতীর কাহিনী।"—এ মুখবন্ধটুকু সত্য নয়—জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ানো কঠিন। আমাদের মতো যাঁরা সীমা-খণ্ডিত মানুষ—তাঁরা জীবনযাত্রায় খোঁড়া পায়ে চলছে, কখনও বা অকেজো সৈনিকের মতো পিছনে পড়ে থাকছে। হয়তো জীবিকা কিংবা জীবন-ধারণের নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে—কিন্তু শান্তিরঞ্জনবাবু, আমরা অনেকেই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি, এ গল্পগুলির যুবক-যুবতীরাও পারে নি। পারে না। আসলে, জীবনযাপনের সমস্যার মুখোমুখি এরা দাঁড়াতে চেয়েছে।

মুখোমুখি দাঁড়াবার পর, প্রতিরোধ। এবং কি সেই প্রতিরোধের ফলাফল? শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, 'জীবনের হাতে মার খাচ্ছে।' অর্থাৎ অস্তিত্বের সমস্যায় বিষমভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে। এ কথা সত্য, নিষ্ঠুর হলেও সত্য। আজকের পৃথিবীতে তৃপ্তি কিংবা মুগ্ধতা দুষ্প্রাপ্য। প্রেম, প্রীতি, নীতি, বন্ধুত্ব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ক্রমশ এলোমেলো এবং বেসুরো হতে শুরু করেছে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এইটাই বিষয়, এবং অত্যন্ত বড় বিষয় নিয়েই তিনি গল্প লিখতে শুরু করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখতেন তিনিও সেই ধারারই মানিকবাবুর পরবর্তী লেখকদের অন্যতম। কিন্তু মানিকবাবুর ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কিছুটা প্রভেদ আছে—সেকথা পরে বলছি।

শান্তিরঞ্জনবাবুর গল্পের গঠন অত্যন্ত নিখুঁত। কোথাও তুচ্ছ ভাবালুতার নামগন্ধ নেই, ভাষা আবেগবর্জিত কিন্তু ঋজু, স্পষ্ট। লেখকের চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। গল্পগুলি হঠাৎ আরম্ভ হচ্ছে মাঝখান থেকে, ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে, আস্তে আস্তে বিষয়ের নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা পাঠকের শ্বাসনালী চেপে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করছে। শুধু তাঁর এইটুকু মাত্র দুর্বলতা আছে যে, তাঁর

এখনও ধারণা নিচুশ্রেণীর লোক—কুলি-মজুর, ফিরিওয়ালা-পকেটমার—এরাই শুধু নির্ভেজাল, সৎ আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক মাত্রই কুচক্রী-বদমাস। এ জন্যই তিনি মন্তব্য করেছেন, "কারণ এই পাঁচ বছর যাদের সঙ্গে ও থাকবে তারা ক্রিমিনাল হলেও নির্ভেজাল মানুষ। তারা আর যাই করুক ভাই হয়ে বোনের সর্বনাশ করে না! বন্ধু সেজে বন্ধুর!"—না, একথা ঠিক নয়। যেখানে লেখকের বিষয়বস্তু জীবন এবং মানুষ—সেখানে এ সব মন্তব্য একটু অকিঞ্চিৎকর।

এই বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প নিটোল, নিখুঁত—প্রতিটি গল্পের পটভূমিকায় ভয়ঙ্কর সর্বনাশ টাঙানো। গল্পের চরিত্রগুলিও পূর্ব পরিচিত মনে হয়—কারণ এদেরই আত্মীয়স্বজন মানিকবাবুর গল্প-উপন্যাসে আছে। কিন্তু এ গল্পগুলি মোটেই মানিকবাবুর তুল্য হতে পারল না, তার কারণ, শান্তিরঞ্জনবাবুর নিষ্ঠুরতার প্রতি একটা অকারণ প্রবণতা আছে। তিনি স্বেচ্ছায় এদের ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর-তরতে নিয়ে গেছেন। মানিকবাবু নির্লিপ্ত, তাঁর নায়ক-নায়িকা আঘাতে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে—তবু বেঁচে থাকা যে কত রমনীয় মানিকবাবু তা কখনও ভুলতে দেন নি।

কিন্তু শান্তিরঞ্জনবাবু শুধু রামনিধিকে মারেন নি, যতীন দত্তকে তন্মুহূর্তে চোর বানিয়েছেন, 'মা' গল্পে একটি অসাধারণ করুণ বিষয়কে বারবার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, শচীবিলাসকে কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে দিলেন না তিনি। শান্তিবাবু মানুষকে বেঁচে থাকতে দিন, দুর্বল হোক তবু মেরুদণ্ড সোজা রাখতে দিন, বেদনার পাশে সম্ভাবনা মুখ গুঁজে শুয়ে থাকুক।

আমি আশাবাদের স্থূল প্রচারক নই। কিন্তু নির্মম দুঃখকষ্টের হুবহু চিত্র তুলে ধরার চেয়ে কেন এই দুঃখ—সেই দিকে গল্পের মুখ ফেরাতে বলি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকিত সমন্বয় ॥ আলোক সরকার। মিত্রালয়। দু টাকা ॥

পঞ্চাশের তরুণ কবিদের মধ্যে ইতিমধ্যেই যাঁরা স্বকীয় মর্যাদায় যশস্বী হয়েছেন, কবি আলোক সরকার তাঁদের অন্যতম। 'আলোকিত সমন্বয়' কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'উতল নির্জন'-এর প্রায় এক দশক পরে প্রকাশিত হল।

যখন পঞ্চাশের যুগের অনেক কবিকে ঠিক একই রকম কবিতা লিখতে দেখা যায়, তখন অনুত্তর-তিরিশ এই কবির কণ্ঠস্বর, ছন্দ ও শব্দ চয়নের স্বকীয়তা, এবং তৎসহ নিজের একটি কাব্যজগৎ নির্মাণ করার মতো মৌলিকতা লক্ষণীয়। কখনও কখনও অধিক রক্তক্ষরণে আহত, পাণ্ডুর কবিহৃদয়ের রক্তহীন বেদনার প্রকাশ তাঁর কবিতায় দেখা গেলেও, মৌলিক অর্থে কবি আলোক সরকার প্রেম, স্মৃতি, নিসর্গ ও মিষ্টিক-ধর্মী কবি। কিন্তু প্রতি পঙক্তি উচ্চারণের মধ্যে শিশুর কণ্ঠস্বর শোনবার মতো বিস্ময়কর অনুভব পাঠক পাবেন। বর্তমান-বিখ্যাত বহু চিত্রীর মধ্যে যেমন শিশুর চোখ দিয়ে জগতের রহস্যময়তার আদিম বিস্ময়ে ফেরবার প্রবণতা ও তপশ্চর্যা দেখা গেছে, আমাদের বাংলাদেশে কবিতা রচনার জগতে অনুরূপ প্রচেষ্টা (ও সাফল্য) লক্ষ্য করা গেল। 'বিশেষণ'কে বিশেষ্য গড়ে নেবার মৌলিক চেষ্টাও সেই দৃষ্টিকোণের পরীক্ষানিমিত্ত ফলশ্রুতি। তবু একটি কাব্যগ্রন্থে প্রায় একই ছন্দের ও একই পরিমণ্ডলজাত কবিতা সাজানোর বিশিষ্টতা হয়তো বহু পাঠকের ক্ষেত্রে একঘেয়েমির অভিজ্ঞতা আনতে পারে। তবু এরকম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে, বাজারের দিকে চোখ রাখা, কিংবা কবি কাব্যরচনায় কত চতুর তা দেখানো যখন প্রায় বহু কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের চটকদারী নৈপুণ্য, তখন একজন তরুণ বিশিষ্ট কবির আড়ম্বরবিহীন প্রচ্ছদপটের নিরাভরণ সুদূরত্ব ও একাকীত্ব, একই মানসিক পরিমণ্ডলের রূপচিত্র, কবিকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। কবির স্পন্দিত হৃদয় স্পর্শ করার মতো মাদকতা মনে সঞ্চারিত হয়।

তবুও কবিতা আলোচনার বেলায় বহু প্রশ্ন বাকি থেকে যায়, সমবয়সী কোনও কবির সম্পর্কে আলোচনা করারও বহু অসুবিধা থাকে। বস্তুত সমকালীন বাংলাদেশে জন্মে ও বেঁচে থাকা সত্ত্বেও কবি আলোক সরকারের কাব্য ও বক্তব্য, প্রশ্ন ও আনন্দ-বেদনা বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া সম্ভব নয়। এ নিয়ে ব্যক্তিগত বহু প্রশ্ন তোলা সম্ভব। আমার কাছে বিশ শতকের দেশবিদেশে মানবমুক্তিসংগ্রাম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যথার্থ মানবিকতার বিকাশ শ্রেণী শোষণহীন সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। সাহিত্য, শিল্প ও মানসিক নক্সার নানা অভিক্ষেপময় সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, একটি বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে উৎপাদন সম্পর্কের বিভিন্ন সংঘাত-প্রতিসংঘাতে নির্মিত হয়। একটি বিশেষ সময়ে কবির জীবনে পরিবেশ বা পরিমণ্ডল লালনকার্যে নিসর্গচিত্রই একমাত্র আশ্রয় নয়। অনাহার, অবিচার, দুর্নীতির লীলাক্ষেত্র স্বদেশের দুঃখজয়ী মানবের জীবনযাপনের যুদ্ধে নিত্য প্রতিসংঘর্ষে রণক্ষেত্রে তাদের পাশে দাঁড়ানো আধুনিক কবির মানবিকতার শ্রেষ্ঠনিদর্শন। মানবধর্মে যেহেতু কবির দীক্ষা হয়, তাই কবির সমাজের দিকে সহজ চোখে তাকানো নিতান্ত প্রয়োজন। সামাজিক পরিমণ্ডল ও নিসর্গ পরিমণ্ডল মৌলিক মূল্যে পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। তবুও বর্তমান বাংলাদেশের বিধ্বস্ত হতাশায় যখন বহু কবিই প্রায় 'অযৌক্তিকতাবাদী', তখন নিসর্গও শৈশবের স্মৃতিতে ফিরে যাওয়া এই কবির কবিতা পড়ে তৃপ্ত হওয়া চলে। বেদনাতুর শিশুর চোখে দেখার জগৎ, যেখানে বিকৃতি, সমাজের দুঃখবেদনা পৌঁছয় না, সেই জগতে কখনও কখনও চোখের সামনে এমন অদৃষ্টপূর্ব রহস্যময়তার সমারোহ ধরা পড়ে যে, মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। একই কথা, শব্দ ও কণ্ঠস্বরের পৌনঃপুনিকতা ক্লান্ত করলেও চমকে উঠে আশ্বস্ত হয়ে যাই যখন তাঁর প্রথম কবিতাতেই :

'আমি তোমার পাগল বন্ধু আকাশ অন্ধকারে।

এই ধরনের পংক্তি চোখে পড়ে। বহু কবিতাই অনাবশ্যক দীর্ঘ বলে মনে হয়েছে। কখনও কখনও কোনো কোনো কবিতা আদৌ কবিতা কিনা সন্দেহ হয়েছে। আবার বহু কবিতা পাঠ করে দীর্ঘশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে ভেবেছি এই কবির কবিত্ব কত অনাবিল, আশ্চর্য ও অভ্রান্ত।

আলোক সরকারের এই গ্রন্থখানি সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর চরিত্র পাওয়া যায় নীচের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাটিতে। পাঠকই বিচার করুন এই স্নিগ্ধ, সুদূর ও একা কবির কণ্ঠস্বর :

মাগো, আমার খেলার পুতুল অনেকদিন হারিয়ে গেছে
সমস্ত ঘর এখন একলার।
উঠোন ভ'রে হাওয়া আসে ভালোবাসবে ব'লে
ওদের মুখ। আমি কী করে আর পাতব সংসার!
এলোমেলো রাঙা-শাড়ি ছড়িয়ে আছে ঘরের মলিন কোণে
কাকে ঘিরে আনবে আমার আকাশ-ভরা দিন?
সকল আয়োজনই আমি ভাসিয়ে দেবো ধুলোর ম্লান কোলে
একলা তারা করুণ অর্থহীন।

তরুণ সান্যাল

আলোর আকাশ ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত। দু টাকা ॥

চালচিত্র ॥ চিত্ত সিংহ। এক টাকা পঞ্চাশ ন. প. ॥

কথা ও ছাই ॥ বিতোষ আচার্য। দু টাকা ॥

কান্নার রং ॥ মহুয়া। দু টাকা ॥

আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন ॥ বি. বিশ্বনাথন। এক টাকা ॥

কবিতা-আন্দোলন বাংলাদেশে দিনের পর দিন বাড়ছে। শুধু নতুন নতুন কবির সংখ্যাই নয়, পাঠকের সংখ্যাও বেশ এক নির্ভরশীল গরিষ্ঠতায় দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের কবিতা এখন ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা আক্রান্ত নয়। শুধু মানসিকতায় নয়, রক্তমাংসের পদচারণার ফলে বিভিন্ন দেশের কাব্য-ভাস্কর্য তার চোখে প্রত্যক্ষ হয়েছে। ইউরোপীয় কবিতা-আন্দোলনের ঢেউ এখন বাংলা কাব্যের দেহে পাওয়া যায়।

"আলোর আকাশ" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত বাংলা কবিতার পাঠকদের মহলে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। অন্তরঙ্গ শব্দ-ব্যবহার এবং সংগীতধর্মী মেজাজের জন্যে তাঁর কবিতা বেশ স্বাদু হয়ে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু পঙক্তি পাঠ করতে ইচ্ছে করে। সুশীলবাবুর কাব্য-বক্তব্য সরল এবং ঋজু। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের কথা, দুর্ভাগা দেশের কথা এবং মানবিক মমতায় গাঢ় হয়ে-ওঠা তাঁর কণ্ঠধ্বনির অথাদ সততা যে কোনো মনকেই স্পর্শ করবে।

বিভিন্ন সময়ের জন্যে বিভিন্ন মেজাজের কবিতা আছে। কিছু কবিতা আবৃত্তির যোগ্য, কিছু কিছু মনে মনে পড়ার জন্যে। দুটোরই প্রয়োজন আছে। দেশকাল এবং জনসাধারণের দিকে চেয়ে এই প্রয়োজন মেটাতে হবে। এ-ছাড়া একথা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে বাংলা-কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরো করা দরকার। প্রবীণ থেকে নবীন, কেউই এ-ভাবনা থেকে বাদ নেই। নবীনদের জন্যে বিশেষ করে আরো স্বাধীনতা, আরো অন্তরঙ্গতার প্রশ্রয় দিতে হবে।

"চালচিত্র" এবং "কথা ও ছাই" গ্রন্থদ্বয়ের কবিগণ এখনো অনুসন্ধান-ব্যাপৃত। ছন্দ, শব্দ এবং বক্তব্যের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য তাঁরা ব্যস্ত। জায়গায় জায়গায় চমকপ্রদ চিত্রকল্পের ব্যবহার, ছন্দ এবং বিশেষণের তাৎপর্য উপলব্ধিতে উভয়েই মগ্ন। এর মধ্যে চিত্ত সিংহের অটোবায়োগ্রাফি

ধাঁচের কবিতাগ্রন্থ একটু নতুনত্ব আনতে পেরেছে। যদিও "কথা ও ছাই"-এর কবির কিছু কিছু অভিজ্ঞ মানসিকতা কবিতা ছাড়াও এক বিশেষ উপলব্ধি। কবিতা এখানে একটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। তা হল সৃষ্টিমূলক নবীন ভাবনার সংযোজন।

উপরোক্ত তিনজন কবি মূলত রোম্যান্টিক। যদিও তাঁদের মধ্যে গভীর উপলব্ধির তারতম্য আছে।

ছন্দোবদ্ধ পদ লিখলেই কবিতা হয় না, এক একটা কবিতা হল এক একটা ভাস্কর্য সৃষ্টির মতো। একটা কবিতা লিখতে অনেক কবিতা-লেখার রক্তাক্ত প্রয়াস করতে হয়। শুধুমাত্র ছন্দ ভাবনার রাসায়নিক সংমিশ্রণেই ফল পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া আরো একটা বস্তুর প্রয়োজন, তা হল কাল-চেতনার উপলব্ধি। "কান্নার রং"-এর লেখক সম্পর্কে একটু আশাবাদী হতে চাই।

"আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন" মনে দাগ কাটার মতো কোনো সংকলন-গ্রন্থ হতে পারে নি। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কবিতা-আন্দোলনের কোনো আশাপ্রদ চেহারা অন্তত এই সংকলন-গ্রন্থে উপস্থিত হয় নি। আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক ও অনুবাদকের কাছে সেই আশা করব যাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি কোনো পরিণত সংকলনে হাত দেন।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা ॥ দিলীপ বসু। পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ। বার আনা ॥

সত্যসন্ধানী মানুষের অগ্রগতির বিজয়কেতন বহন করে যাত্রা শুরু করেছে মানুষের হাতে-গড়া মহাব্যোমযান। পৃথিবীর মহাকর্ষ-জনিত বল (gravitational force)-কে পরাজিত করে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রের আকর্ষণের গণ্ডী অতিক্রম করে সূর্যের উদ্দেশে তার যাত্রা সার্থক। মানুষ স্বপ্ন দেখে গ্রহান্তর অভিযানের, নক্ষত্র জগৎ বিচরণের ; এ দশকের বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর আবিষ্কার রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের সে স্বপ্নকে সার্থক করেছে ; মানুষকে করেছে আরও আশাবাদী। সেই আবিষ্কারের কথা, সেই আশার কথা শ্রীদিলীপ বসু এই পুস্তিকায় ব্যক্ত করেছেন।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হলে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক দেশবাসীরই

দায়িত্ব হবে বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করা। দেশবাসীর মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ও প্রেরণা জাগানোর উপায়গুলির মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানালোচনা ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা অন্যতম। তাই 'মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা' পুস্তিকার মতো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ একান্তভাবে স্বাগত ও আশাপ্রদ। শ্রীবসু এইজন্য ধন্যবাদার্হ।

এ পুস্তিকায় সংক্ষেপে মহাকাশ অভিযানে দু বছরের প্রগতির ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মহাকাশে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ স্থাপনের প্রক্রিয়াটি বর্ণিত হয়েছে। চন্দ্রলোকে যাত্রা পথে মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান স্টেশন এবং গবেষণাগার নির্মাণ, নূতনভাবে সজ্জিত হয়ে সে স্টেশন থেকে যাত্রার কথা, পথের নানা বিপদের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন্ত কুকুর লাইকা বহনকারী দ্বিতীয় স্পুটনিকের বর্ণনা, গ্রহান্তরে এবং নক্ষত্রলোকে ভ্রমণের সম্ভাবনা এবং আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা স্থান পেয়েছে। 'মহাকাশ ভ্রমণের রাজনৈতিক ও আইনগত সমস্যা' অংশটিও সুলিখিত।

আন্তর্জাগতিক ভূপদার্থ বর্ষের প্রয়োজনীয়তা এবং সেক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের অবদান পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সৌরজগতের নূতন সদস্য কৃত্রিম গ্রহ প্রেরণ, পুস্তিকা প্রকাশনাকালীন মহাকাশ বিজয়কথার সর্বশেষ অধ্যায়। আশা করি, নূতন সংস্করণে পরবর্তী প্রগতির ইতিহাস রচিত হবে।

প্রসঙ্গত লেখক চন্দ্রজয়ের প্রথম মার্কিন প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে সংক্ষেপে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রয়োজনীয় চিত্রাবলীতে পুস্তিকাটি শোভিত। প্রচ্ছদপটে চিত্রকর চেস্লি বনস্টেলের আঁকা সম্ভাব্য চন্দ্রলোকগামী ব্যোমযানের চিত্রটি চিত্তাকর্ষক।

পরিশেষে বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কয়েকটি অবশ্যলক্ষণীয় বিষয়ের প্রথম এবং প্রধান হল পরিভাষা। বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নিবন্ধ অপ্রচুর, তাই রচয়িতাকে এর শৈশবস্থায় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে বাংলা সাহিত্যের এই শাখার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কিন্তু এ পুস্তিকায় এ ব্যাপারে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। '......উপগ্রহের নিজের গতিবেগ হচ্ছে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল—এই গতিবেগ তার কেন্দ্রাতিগ শক্তি।'—এরূপ উক্তি বিজ্ঞানালোচনা ক্ষেত্রে ভুল বোঝার সৃষ্টি করে। Force-এর অনুবাদে কোথাও কোথাও লেখা হয়েছে—'শক্তি', যা ত্রুটিপূর্ণ। 'পৃথিবীর সঠিক চেহারা নির্ণয়' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—"পৃথিবী বিষুবরেখার কাছে ১৲।১৪ মাইল চওড়া···"—এ কথাটির অর্থ বোঝা গেল না।

আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কবিতার উদ্ধৃতি একস্থানে নিবন্ধের আদর্শ-বিচ্যুতির কারণ হয়েছে বললে অন্যায় হবে না।

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরবার পথে জাহাজে হ্যারি পলিট্-এর মৃত্যু হয়েছে, এ সংবাদে আমরা ভারতবর্ষের লোকেরাও একটি সশ্রদ্ধ বেদনাবোধ করছি।

সাফল্যেরই সম্মান পৃথিবীতে। যে স্বল্প সংখ্যক মানুষ সার্থকতা অপেক্ষা আন্তরিক সাধনা-বলে মানুষের কাছে সম্মানিত হয়েছেন হ্যারি পলিট্ তাঁদের অন্যতম। বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সেক্রেটারি হিসাবেই তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ দিনের পরিচয়। যুদ্ধান্তে তাঁকে আমরা ভারতবর্ষেও দেখেছি, কলকাতার বিরাট ময়দানে তাঁর অবিস্মরণীয় ভাষণও শুনেছি। কিন্তু বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যায় ক্ষুদ্র, বিলাতের রাজনীতিতে তার প্রভাবও সামান্য। পলিট্ ও তাঁর সহকর্মীরা সেই গণনায় নিশ্চয়ই সাফল্য-মণ্ডিত। অবশ্য আজকের গণনাকে কালকের অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই হিসাব উল্টে যেতেও পারে। সেই সম্ভাবনা দিয়েই এঁদের পরিমাপ—কালকের জন্যই এঁদের আজকে বাঁচা। এই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় পলিটের বাগ্মিতায় ও আত্মজীবনীতে—দুএর মধ্যেই আন্তরিক আস্থায় দৃপ্ত সহৃদয় শ্রমিক সন্তান সমুজ্জ্বল। মানুষকে ভালোবাসলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেই হয়।

রবীন্দ্রোৎসবের সাহিত্যিক-সংকল্প

অসংখ্য রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জোয়ারের মধ্যে কলকাতায় সকল মতের সাহিত্যিকেরা মিলিত হয়ে মহাবোধি হল-এ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনের পৌরহিত্যে যে কবিপূজা উদ্‌যাপন করেন তা ছিল গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা। রবীন্দ্র রচনা পাঠে ও আবৃত্তিতে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরিবেশনেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর অন্তত প্রধান দিনটি যে উৎসর্গ করা বিধেয়—এ আমাদের সুদৃঢ় মত। সাহিত্যিকরা যে পথ প্রদর্শিত করলেন তা জন-সাধারণকেও গ্রহণ করতে তাঁরা প্রবুদ্ধ করবেন, এই আমাদের কামনা। উদ্যোক্তাদের আমরা তাই অভিনন্দিত করি।

তার অপেক্ষাও বড় অভিনন্দন সেই উদ্যোক্তাদের প্রাপ্য। সেদিনের প্রস্তাবানুযায়ী আহূত সাহিত্যিক পরিষদ সম্প্রতি এক বৈঠকে প্রস্তাব করেছেন যে, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব বাঙলা সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তাঁরা উদ্‌যাপিত করবেন—(১) কলকাতায় আগামী পঁচিশে বৈশাখের শেষে এক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন করে—সে অধিবেশন হবে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যসেবীদের যুগ্ম অধিবেশন এবং তাতে আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্য আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট থাকবে; (২) গান, পাঠ, আবৃত্তি ছাড়াও সে সময়ে সাহিত্যিকরাই একটি রবীন্দ্রনাটক অভিনয় করবেন, (৩) এবং রবীন্দ্রস্মরণে একখানি আলোচনা সংকলনও প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারী কার্যক্রমে বাংলাভাষা প্রয়োগের জন্যও তাঁরা দাবী জানান।

এই উদ্দেশ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি পরামর্শ পরিষদ ও একটি কর্মী পরিষদ গঠিত হয়েছে, 'মিত্রালয়' (১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা) তার কার্যালয়; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই লেখক মণ্ডলীর সম্পাদক। পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্য কর্মীদের এই অনুষ্ঠানের সদস্য হতে পরিষদ আহ্বান জানিয়েছেন।

এই আহ্বানে সকলে সাড়া দেবেন, এই আমাদেরও প্রার্থনা। আর, এঁদের সংকল্প সর্ব রকমে জয়যুক্ত হবে, এই আমাদের কামনা।

নাট্যপ্রসঙ্গ

গণনাট্য সঙ্ঘের সম্মেলন ছাড়াও অন্তত আরও দুটি বিরাট নাট্যোৎসব সপ্তাহাধিক কাল ধরে বর্ষে বর্ষে বাঙালীকে নাট্য-সচেতন করে; রঙ্গালয়ে শতাধিক রজনী সগৌরবে অভিনীত হয় একাধিক বাঙলা নাটক। এমন কি নাটক অভিনয় ও প্রযোজনা নিয়ে বিতর্ক চলে গুণী ছেড়ে সাধারণের মহলে। তথাপি প্রশ্ন ওঠে—বাঙলা নাটক কোথায়? কারণ, ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙলা দেশেই সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। অথচ, পাশ্চাত্ত্য বহু দেশের তুলনায় নাট্য রচনায় আমরা এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছি না। আশার কথা এই যে, আমরা নিরুৎসাহও নই, নিশ্চেতনও নই।

সেই আশার এক আলো 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে লিট্‌ল্ থিয়েটর গ্রুপের নূতন অভিনব পরীক্ষা ও প্রয়াস। 'অঙ্গারের' শততম অভিনয় ও তাঁদের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপনে তাঁরা নতুন দৃষ্টির পরিচয় আরও সার্থকভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। দুর্ঘটনায় সুদীর্ঘ সংগ্রামে জয়ী খনি মজুরদের তাঁরা সেদিন ন্যায়সঙ্গতরূপেই প্রধান অতিথির সম্মান দান করেছেন—তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন দর্শকদের—যারা অচিরেই 'অঙ্গারে' অনুরূপ এক দুর্ঘটনার নাট্যাভিনয় দেখতে পাবেন! মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ তা ছাড়া দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দেন তাঁদের নেপথ্যচারী কর্মীদের সঙ্গে; আর, নিজেদের বৈষয়িক সার্থকতার ফলভোগী করে নিম্নতর কর্মীদের দেন এক মাসের বোনাস। আমার সর্বান্তঃকরণে বলছি—এই নাট্য-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

'অঙ্গারের' অভিনয়ে মিনার্ভা বৈষয়িক ভাবে কতকটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছেন নিজেদের সাহসে ও শিল্প-দৃষ্টিতে। বিতর্কের কারণ আছে জেনেও আমরা বলতে পারি—'অঙ্গার' বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একটি স্মরণীয় প্রস্তাবনা—যেমন প্রস্তাবনা গত দুই দশকের মধ্যে হয়েছে 'নবান্ন', হয়েছে 'রক্তকরবীর' অভিনয়ে। প্রত্যেকবারই নতুন প্রশ্ন উঠেছে, কারণ নতুন দিগন্তেরও সন্ধান তাতে পাওয়া গিয়েছে। 'অঙ্গারে' এ সন্ধান বহন করে এনেছে প্রধানত দুটি বস্তু—এক মজুর জীবনের কঠিনতম বাস্তবতা ও নীরন্ধ্র অমানুষিকতা আমাদের রঙ্গমঞ্চে এভাবে উত্থাপিত হল এই প্রথম। দুই—তার প্রযোজনার দিক, এমন অদ্ভুত প্রযোজনা আলোক-শিল্পের এই সার্থক প্রসারের পূর্বে অগোচর ছিল। এই প্রসঙ্গেই তাই বলা যেতে পারে—'অঙ্গারের' প্রধান রচয়িতা আলোক-শিল্পী শ্রীযুক্ত তাপস সেন—নাট্যকার নন, অভিনেতারাও নন। তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালনে কার্পণ্য করেন নি; কিন্তু আলোকশিল্পই তাঁদেরও প্রধান নির্ভর। বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, শুধু এই মাত্র বলতে পারি—আমরা এই অভিনব প্রযোজন-সৌকর্যে আপত্তি দেখি না। সভ্যতা যখন নতুন উপকরণে আমাদের বলিষ্ঠ করছে শিল্পকলা তখন তার সহায়ে নিজেকে পরিপুষ্ট করবে না কেন? কে না জানে, এরূপ সব শিল্প-প্রয়োগেই মাত্রাজ্ঞান অলঙ্ঘনীয়? তা ছাড়া, শিল্প-আয়োজন হিসাবে 'অঙ্গার' আর-একটি সংশয়ও আমাদের মনে জাগিয়েছে। 'অঙ্গার' নাট্যকলায় বাস্তবের আত্মপ্রকাশ—শুধু আত্মপ্রকাশ নয়—প্রতিশোধাত্মক অভিযান। 'অনুকম্পা-আশঙ্কায়

চিত্তশুদ্ধির' অবকাশও দেয় না, চৈতন্যকে পরিক্লান্ত করে। শিল্পের অর্থ কি, ট্র্যাজিডির সার্থকতা কিসে? কিন্তু এ প্রশ্নও আলোচনা-সাপেক্ষ। তাই, আমাদের কামনা—'অঙ্গার' বাঙালী জনসাধারণের মত নাট্য-রসিকেরাও দেখবেন—তা স্মরণীয় এক প্রকাশ।

বাঙলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ চিরদিনই সৌখীন নাট্যদলের থেকে আপনার শক্তি সঞ্চার করেছে। আজ যাঁরা সৌখীন, কাল তাঁরাই হন সু-সিদ্ধ রঙ্গ-শিল্পী। যাঁরা তা হন না, তাঁরাও রঙ্গমঞ্চের কম সহায়ক নন। সম্প্রতি আমরা দুটি মঞ্চাভিনয় দেখে তা আরও অনুভব করেছি। একটি ঘণ্টা দেড়েকের 'প্রহসন' বা কৌতুক নাট্য—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও প্রযোজনা—তিনিই তার অভিনয়ের অন্যতম শিল্পীও। অন্য সকলে সৌখীন অভিনেতা—প্রায় সকলেই প্রথম দাঁড়িয়েছেন দর্শকের সম্মুখে। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে এঁদের ত্রুটিবিচ্যুতি না থাকাই আশ্চর্য। কিন্তু কতকটা রচনার গুণে, কতকটা অভিনয়ের গুণে, অনাবিল হাসি হেসেছি এবং মধ্যে মধ্যে একটু ভেবেছিও।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর 'মরুঝঞ্ঝা' বড় নাটক, তার বিষয় ও পদ্ধতি দুইই গভীর; তা ছাড়া 'পাব্লব ইনস্টিটিউটের' বার্ষিক সম্মেলনে অভিনীত এই নাটকখানা উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও কুণ্ঠাহীন। নাটকের বিষয়বস্তু—মধ্যপ্রাচ্যের একটি কল্পিত রাজ্য সামরিক একনায়কত্বের পতন-পূর্ব উগ্র দমন-কাণ্ড। অতি বিশ্বস্ত ও নিপুণ ভাবেই তাই নাট্যকার উদ্ঘাটিত করেছেন—কি কি কৌশল, গুপ্ত হত্যা, প্রবঞ্চনা, দেশীয় কায়েমী স্বার্থের ও বৈদেশিক-শক্তির গোপন ষড়যন্ত্রের যন্ত্ররূপে 'সামরিক একনায়কত্ব' ক্ষমতা হস্তগত করে, দেশকে বিক্রয় করে, জনস্বার্থকে দলিত করে, গণতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে—এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবকেই অনিবার্য করে তোলে। একনায়কত্বের এই বিশেষ কুটিল পর্বের সম্বন্ধে ভারতবর্ষেরও যে সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তা না বললেও চলে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি আছে ভাববস্তু—একনায়কত্বের সমস্ত পীড়ন একটি সাধারণ ভীত-চিত্তা সামান্য নারীও আপনার মনের জোরে সহ্য করে মানসিক ও রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন—মানুষের মনের শক্তিও এমনি আশ্চর্য, তার সীমাশেষ এখনো জানা যায় না। এই মানবীয় পাব্লব-তত্ত্ব ও প্রতিপক্ষের ফ্রয়েডীয় বিরত-তত্ত্বের ব্যর্থতাও নাটকের বিষয়। এরূপ বিষয়-বাহুল্য সত্ত্বেও যে নাটকখানি

বিশৃঙ্খল হয় নি, তাই প্রবীণ নাট্যকারের প্রধান সার্থকতা। ঘটনা যোজনায়ও নিপুণতা আছে। সৌখীন দলের শিল্পীদেরই তাই ছিল অভিনয়ে কঠিন পরীক্ষা। তাঁরা যে অভিনয়গুণে নাটকের বিষয়-সমূহকে দর্শকের চেতনায় পৌঁছে দিতে পেরেছেন এতেই তাঁদের কৃতিত্ব। আর আমরা তা বিশেষভাবেই অনুভব করেছি।

গোপাল হালদার

সুধীন্দ্রনাথ ও 'পরিচয়'-এর জন্মকথা

বর্তমান যুগের পুরশ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অকাল আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্যজগৎ মুহ্যমান। তাঁর বয়স ষাটও হয় নি; এবং তাঁর দেহে ও মুখমণ্ডলে অটুট স্বাস্থ্যের দীপ্তি নিত্য বিরাজিত ছিল। যেমন কাব্যে ও সাহিত্যে তেমনি বহুবিষয়ে জ্ঞান ও চর্চা এবং বহু ভাষায় দখল তাঁকে বিদগ্ধ ও গুণীসমাজে বিশিষ্ট আসনের অধিকারী করেছিল। তিনি ছিলেন আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর এরকম আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি একান্ত বিমূঢ়। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সমূহ বলবার বা বিচার করবার যোগ্যতাও আমার নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কাব্যবীণায় তিনি নিজস্ব একটি তন্ত্রী যোজনা করেছিলেন: তৎসম ও সংস্কৃত শব্দ-সমৃদ্ধ, ভাব ও ছন্দের গাঢ়বদ্ধতার তন্ত্রী। ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চয় আলোচনা করবেন। আমি একটি বিষয়ে যৎসামান্য বলতে ইচ্ছুক—সে 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে। একদিন আমারই কাছে, তিনি একটি নূতন ধরনের বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প প্রথম ব্যক্ত করেন ও ঐ কাজে আমার সাহায্য চান। আমাদের উভয়ের একত্র চেষ্টার ফলে 'পরিচয়' জন্মলাভ করে। 'পরিচয়'-এর এই জন্মকথা লিপিবদ্ধ করে আমারও বহুলোকের প্রিয় কবির স্মৃতি-তর্পণ সমাধা করতে পারব, এই আশা।

১৯৩০, মে-জুন মাস। একদিন বন্ধুবর প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ বসু ডালহৌসি স্কোয়ারে আমার কর্মস্থানের আপিসঘরে সুধীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। যেমন তুমি একদিন কবিগুরুর সঙ্গে একত্রে বিলাত যাত্রার ভাগ্যলাভ করেছিলে, সুধীন্দ্রও এবার তেমনি কবির সঙ্গে একত্রে ইংলণ্ড-আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। এছাড়া এর আপিস তোমার আপিসের সংলগ্ন। তোমাদের আলাপের খুব সুবিধা হবে।

সানন্দে সুধীন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, তাঁর পিতৃদেব ছিলেন আমার দাদামশায়ের বন্ধু।

সেই দিন থেকে আরম্ভ হল আপিস-ফেরত একত্রে গৃহপ্রত্যাবর্তন। সুধীন্দ্রের আপিস ছিল আমার আপিস কামরার একেবারে পাশেই। তিনি ছিলেন লাইট অফ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানির সেক্রেটারি। আপিসের ছুটি হলে আমার কামরায় আসতেন ও অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না আমি নিষ্কৃতি পেতাম। তার পর হত তাঁদের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে কফি সেবন ও বিশ্রম্ভালাপ। তাতে এসে যোগ দিতেন কবি-প্রিয়া—তাঁর প্রথমা স্ত্রী। সুধীন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ হল ফটোগ্রাফিতে ও আমাদের আফিসের সর্বোচ্চমূল্যের এর্নেমান এফ/১·২ ক্যামেরা কিনে রঙীন ছবি তোলা আরম্ভ করলেন। আমার এ বিষয়ে যতটুকু বিদ্যা ও কারিগরি ছিল তা তিনি অনায়াসেই আয়ত্ত করলেন।

একদিন সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র হঠাৎ ফটোগ্রাফির পরিবর্তে খাতা খুলে তাঁর রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনালেন। মনে হল এক অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। তাঁকে তা বলতে দ্বিধা করলাম না। সে সময়ে বাংলা কবিতা পড়তে যা সুযোগ পেতাম পড়ে মনে হত রবীন্দ্রবন্ধনী ছাড়িয়ে যায় নি। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী মশায়ের সনেটে নতুনত্বের রসোপলব্ধি হত; এবং মোহিতলাল মজুমদারের "বিস্মরণী" বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল প্রচুর। তখন বিষ্ণু দে-র কবিতা নিশ্চয় দু-চারটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু তা পড়ার আমার সৌভাগ্য হয় নি। সুধীন্দ্রের কবিতার গাঢ়বদ্ধতা ও কঠিন সৌন্দর্য সহজেই আমাকে বিমুগ্ধ করল। স্পষ্ট মনে হল রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথের অনুবর্তন করেও নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন—এ কবি। এর পর থেকে ফটোগ্রাফির সঙ্গে সমান পাল্লা দিল সুধীন্দ্রের স্বরচিত কবিতাপাঠ। কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপূর্ব ভঙ্গিতে পড়ে শোনাতেন। সুধীন্দ্রনাথকৃত কবিতাপাঠ অনেকেই ইদানিং শুনেছেন; নিশ্চয় তাঁরা আমার বক্তব্যের সাক্ষ্য দেবেন যে সুধীন্দ্রের কবিতাপাঠ-কলা অসামান্য।

এর আগেই তাঁর 'তন্বী' প্রকাশিত হয়েছিল ও তিনি তা কবিগুরুকে দিয়েছিলেন। বোধ হয় কিছু উপদেশ মিশ্রিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। 'তন্বী'র কবিতাগুলি থেকে বাছাই করে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করে লিখতেন এই সময়, ও নতুন অনেকগুলি কবিতা লেখা হল যা পরে 'অর্কেস্ট্রা'য় প্রকাশিত হয়। একদিন তিনি আমাকে তাঁর 'উটপাখী' কবিতাটি পড়ে শোনালেন। আমার প্রশংসা বাক্য বোধহয় সেদিন এতই উচ্ছ্বসিত হয়েছিল যে তিনি স্বয়ং সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। অতঃপর আমি একদিন প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার লেখা 'নৌকাডুবি'র প্লট পড়ে শোনালাম। ক্রমে উঠল কাব্যালোকের মোহময় সন্ধ্যাগুলি।

১৯৩০-এর শেষের দিকে অথবা ১৯৩১-এর গোড়ায় এমনি এক সন্ধ্যায় সুধীন্দ্র বললেন, আমি এক পত্রিকা বার করতে চাই, যদি আপনি সাহায্য করেন। এর কিছুকাল আগে আমাদের একটি আসর বসত, নাম ছিল, সোসিয়েতে অঁ্যাদো ল্যাতাঁ। প্রথম মহাসমরের পরে অনেকে ফ্রান্সের শিল্প-কলা-জ্ঞান বিদ্যা ও ভাষা প্রভৃতির প্রতি বাঙলা যুবকদের একটা নেশা জন্মে। আন্দাজ ১৯২৬ অব্দে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর চেষ্টায় ফ্রেঞ্চ ভাষা ও শিল্পকলার অনুরক্ত ও ফ্রান্স প্রত্যাগতদের নিয়ে উক্ত আসরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আসর বসত আশুতোষ বিল্ডিং-এর একটি কামরায় ও শেষের দিকে ডক্টর প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে; দু-একদিন আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে। মনে পড়ে, অন্যান্যদের মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ির আসরে হাজির হয়েছিলেন সদ্য নামকরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সদ্য অক্সফোর্ড প্রত্যাগত হুমায়ুন কবীরও আমাদের আসরে যোগ দিয়েছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ আমায় অঁ্যাদো ল্যাতাঁর সভ্যদের কাছে নতুন কাগজের জন্য আবেদন জানাতে পরামর্শ দিলেন। ও আসরের তখন সমাপ্তি হয়েছে। আর কিছুদিন জল্পনা-কল্পনার পর সুধীন্দ্র বললেন, আপনার বন্ধু নীরেন রায়কে চাই, তাঁকে বলব কাগজ সম্পাদনার অংশীদার হতে। অচিরে নীরেনের কাছে সুধীন্দ্রকে আমি নিয়ে গেলাম। ডক্টর প্রবোধ বাগচী, ডক্টর সুবোধ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে আনলাম। এ হল ১৯৩১-এর গ্রীষ্মাবশেষ সময়। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রফেসার ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন; তাঁকেও ডেকে আনলাম সুধীন্দ্রের বৈঠকখানায়। এই সময় সব চেয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন পূজনীয় চারু দত্ত (I. C. S.) মহাশয়। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম বিনা 'পরিচয়' বার হত কিনা সন্দেহ। পরে পরিচয়-এ তাঁর অতুলনীয় "পুরানো কথা" প্রকাশিত হয় ও কৃষ্ণ রাও প্রভৃতি গল্পও লেখা হয়।

নীরেনই নামকরণ করলেন 'পরিচয়'-এর ও তাঁরই পরামর্শে কাগজটি

ত্রৈমাসিক হবে স্থির হল। কিন্তু তিনি সম্পাদকের নাম গ্রহণ করতে বিরত হলেন। সাক্ষাৎভাবে সম্পাদনার অংশগ্রহণ না করলেও কার্যতঃ নীরেনবাবু সম্পাদনার অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ও পরিচয়-এর জন্য লেখক ও লেখা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই নিয়ে এলেন হিরণকুমার সান্যালকে, বিষ্ণু দেকে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে—ইত্যাদি। অবশেষে ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হল, সুধীন্দ্র সম্পাদনার স্বাক্ষরে, নীরেনের 'সম্পাদকীয়' যোগে ও আমার হাতে আঁকা 'পরিচয়' নামাঙ্কিত প্রচ্ছদপটে আবৃত হয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি সে সময় শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম।

আজ ইহলোকে সুধীন্দ্র নেই; কিন্তু যাঁরা যাঁরা 'পরিচয়' বৈঠকে যোগদান করেছেন তাঁদের কাছে 'পরিচয়ে'র জন্য সুধীন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

ধন্য জাপান

শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানব সভ্যতার জন্যে জাপানের মানুষ আজ বৎসরাধিক কাল একটানা যে নিরস্ত্র গণসংগ্রাম চালিয়ে আসছেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায় ও আপিসে, বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরে ও অঙ্গনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাভবনে, বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরাটরিতে, জাপানের প্রত্যেকটি বাড়িতে, প্রতিটি রাস্তায়, মাঠে মাঠে, হাটে হাটে, নিরন্তর চলেছে নিরস্ত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ, অক্লান্ত লড়াই। সভা, সমিতি ও জনসমাবেশ, বক্তৃতা ও আলোচনা, সই সংগ্রহ ও দরখাস্ত, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন এই সবের ভিতর দিয়ে জাপানের এই অপূর্ব লড়াইয়ের অষ্টাদশ পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। এখনও অনেক পর্ব বাকি আছে এই লড়াইয়ের কেননা এই সেদিনও জাপানের নেতারা আমাদের বলেছেন, লড়াইয়ের এই সবে শুরু হয়েছে।

জাপানের এটা ন্যায় যুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ তাই জাপানীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। জাইবাৎসুর প্রতিনিধি নোবুস্থকে কিশি ও তাঁর ছোট্ট একটি উপদলকে হাত করে আমেরিকা চাইছে জাপানের উপর একটি 'সংশোধিত' জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি চাপিয়ে দিতে। এ বিষয়ে তিলার্ধ

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই চুক্তিটি জাপানকে পুনরস্ত্রীকরণের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলির বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধ চক্রান্তে জাপানকে জড়াতে চায় এবং জাপানকে আমেরিকার একটি যুদ্ধঘাঁটিতে ও আণবিক সেতুবন্ধে পরিণত করতে চায়। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে :

"দুই পক্ষ, স্বতন্ত্রভাবে ও পরস্পরের সহযোগিতায়···সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সংবিধান অনুযায়ী তাদের প্রতিরোধশক্তিকে রক্ষা করবে ও বাড়িয়ে তুলবে··"

"চুক্তিটিকে কার্যকরী করার জন্যে দুই পক্ষ পরস্পরের সহিত পরামর্শ করবে এবং জাপানের নিরাপত্তা ও সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে যে কোনো এক পক্ষের অনুরোধেই পারস্পরিক পরামর্শ অনুষ্ঠিত হবে।

"···জাপানের নিরাপত্তার জন্যে এবং সুদূর প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার স্থল, জল ও বিমান বাহিনীগুলিকে ব্যবহার করার সুযোগ ও আঞ্চলিক অধিকার দেওয়া হল।"

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, চুক্তিটি জাপানী সংবিধানের বিরোধী। জাপানী সংবিধানের নবম ধারায় লিখিত আছে : "জাপানী জাতি চিরদিনের মতো যুদ্ধকে বর্জন করছে···আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসার উপায় হিসাবে বলপ্রয়োগের পথকে পরিত্যাগ করছে ; যাতে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে, সেইজন্যে স্থলে, জলে ও আকাশে সামরিক বাহিনী কদাচ রক্ষিত হবে না।" জাপানী সংবিধানের এই নবম ধারাটির সঙ্গে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটির কোথাও কোনো মিল নেই। জাপানী সংবিধান এই সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, জাপান নিরস্ত্র থাকবে, কোনো সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অনুশীলন করবে। জাপানী জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্যে অবিলম্বে জাপানের মাটি থেকে আমেরিকার সমস্ত সামরিক বাহিনীকে অপসারণ করা আবশ্যক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জাপানের শান্তিচুক্তির সম্পাদন আবশ্যক এবং চতুঃশক্তির পক্ষ থেকে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে এই গ্যারান্টি দেওয়া আবশ্যক যে, কদাচ কোনো অবস্থাতেই জাপানের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হবে না। জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি কি এইসব দিকে জাপানকে

নিয়ে যাচ্ছে ? অবশ্যই যাচ্ছে না। এই চুক্তি জাপানী সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করে জাপানের তথাকথিত "প্রতিরোধশক্তিকে" অর্থাৎ আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে চায়। এই চুক্তির "নিজ নিজ সংবিধান অনুযায়ী" কথাটি জাপানী সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি এবং জাপানী জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতি একটা নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। এই চুক্তি জাপানের সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিচুক্তির পথ বন্ধ করতে চায় এবং এশিয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহ্নিশেষে ইন্ধন জুগিয়ে সেটিকে চিরস্থায়ী করতে চায়। এই চুক্তি জাপানী জনগণের শান্তি-কামনাকে ও নিরপেক্ষতা-কামনাকে পদদলিত করে জাপানকে মার্কিন সামরিক জোটে সামিল করতে চায়, জাপান থেকে আমেরিকার সামরিক বাহিনীকে অপসারণ করার পরিবর্তে জাপানকে আমেরিকার একটি বৃহত্তর সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করতে চায়। জাপান যাতে হয় এশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার আণবিক ও নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সেতুবন্ধ, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির তাই-ই উদ্দেশ্য।

একথা সুবিদিত যে, সান ফ্রানসিস্কো চুক্তি অনুসারে আমেরিকা জাপানী সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই যে কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জাপানের ভূমিকে ব্যবহার করতে পারে, অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সমেত যে-কোনো অস্ত্র যে কোনো পরিমাণে জাপানে নিয়ে আসতে পারে। আমেরিকা এতদিন জাপানকে একটি উপনিবেশ ও সামরিক ঘাঁটি হিসাবে প্রকাশ্যে যে ভাবে ব্যবহার করে এসেছে, সে সম্বন্ধে, প্রতিবেশী জাতিগুলির প্রতি জাপানীদের এই একটা কৈফিয়ত অন্তত দেওয়ার ছিল যে, জাপানী জনগণের ইচ্ছাক্রমে এটা ঘটছে না। তথাকথিত সংশোধিত জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীকে দেখানো হবে, সোভিয়েত দেশের ও এশীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে আমেরিকার পরার্ধপতিদের যুদ্ধ চক্রান্তে জাপানের মানুষ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করছে। চুক্তিটিতে অবশ্য "পারস্পরিক পরামর্শের" কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে আমেরিকা নিজের যুদ্ধঘাঁটিগুলিকে ব্যবহার করা সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ-টরামর্শ করবে, নোবুস্কে কিশির ও তাঁর অন্তরঙ্গদের এই আজগুবি গল্প জাপানে কেউই বিশ্বাস করে না।

বলা হচ্ছে যে, জাপানের প্রতিরক্ষার ও নিরাপত্তার জন্যেই এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এটা একটা গালগল্প। আমেরিকাকে ও জাপানকে কেউই

আক্রমণ করতে চাইছে না এবং ভয় দেখাচ্ছে না। ইতিহাস বরং এটারই সাক্ষ্য দেয় যে, পঞ্চাশ বছর ধরে জাপানই এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল। জাপানের প্রতিরক্ষার বুলিটা যে নিছক ভণ্ডামি, এটা প্রমাণিত হয় যখন পড়ি যে, "সুদূর প্রাচ্যে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা" জাপ-মার্কিন চুক্তির লক্ষ্য। চুক্তিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব ক্রিষ্টিয়ান হার্টার বলেছেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সুদূর প্রাচ্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিতে সুদূর প্রাচ্য বলতে বোঝায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তো বটেই, উপরন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি—তথা ভারত। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ। এই চুক্তি চাইছে যে, আমেরিকা হবে সমগ্র এশিয়ার পুলিশম্যান এবং জাপান হবে সেই পুলিশম্যানের পুলিশী কুকুর।

এই সম্ভাবনাটা কি জাপানী জনগণের কাছে খুব মহিমময় ও গৌরবময় বলে মনে হচ্ছে ? মোটেই হচ্ছে না এবং হওয়ার কথা নয়। চুক্তিটি আর কিছু হোক বা না হোক, চূড়ান্ত রকমের অবাস্তব। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের স্বপ্ন আজ মহাশূন্যে বিলীন। এশিয়ার জাতিগুলির বিরুদ্ধে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধের জন্যে জাপানী জনগণকে চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে হিরোশিমার ও নাগাসাকির মহাহত্যার আগুনে এবং তার পরেকার ম্যাকআর্থারীয় তাণ্ডবের কালে নিজেদের মূক, বেদনাবিদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসায়। সেই প্রায়শ্চিত্তের আগুনে শুদ্ধ ও কঠিন হয়ে বেরিয়ে এসেছে এক নতুন জাপান। এই নতুন জাপান পূর্বেকার ভ্রান্ত পথ বর্জন করে নতুন পথে বড় হতে চায়। তার সামনে বড় হওয়ার কোনো পথ কি খোলা নেই ? অবশ্যই আছে। সে পথ হল জাতীয় স্বাধীনতার ও সার্বভৌমতার পথ, নিরস্ত্রীকরণের ও শান্তির পথ, এশিয়ার ও পৃথিবীর সকল জাতির সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ। এই পথে গেলে পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, ব্যবস্থিতচিত্ত, সাহসী ও সৌন্দর্য-প্রেমিক জাপানী জাতি পুনরায় বড় হতে পারে এবং এশীয় প্রগতির পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত করতে পারে। এটাই হল জাপানের বড় হওয়ার বাস্তব পথ। এই পথেই জাপানী জনগণ এগুতে চায়।

কিন্তু জাইবাৎসুর কর্তারা ও নোবুসুকে কিশিচক্র—এই মুষ্টিমেয় পাগলের

দল আবার দেখছে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের সেই অতীত ও অলীক স্বপ্ন। জাপানের মানুষ দেখতে চাইছে নতুন জাপানে নতুন প্রভাতের আলো কিন্তু কিশিশাসিত জাপানে তারা দেখতে পাচ্ছে শুধু দুঃস্বপ্নোত্থিত অজীর্ণ রোগীর উদ্গার। এই জিনিসটার একান্ত নোংরামি ও মূঢ়তা জাপানী জনসাধারণের কাছে অসহ। খুব অল্পবুদ্ধি লোকেরাও আজ পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, সমাজ তন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তার শক্তি পূর্বের চেয়ে এখন হাজার গুণ প্রবলতর। জাইবাৎসু ও কিশিচক্র ৬০০ কোটি ডলার পরিমাণ মার্কিন "সাহায্যের" বিনিময়ে আমেরিকার উন্মত্ত বিশ্বজয়ের অভিযানে জাপানকে অংশীদার করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বলি হবে অবিকল জাপানী জনগণ নিজেরাই। নিরাপত্তা চুক্তি!! হায় ভগবান্! বরং এর নামকরণ হওয়া উচিত জাপানের আপদ্‌বর্ধন চুক্তি! ইতিমধ্যেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে সোভিয়েত সরকার শত্রুতামূলক আচরণ বলে মনে করে। ১৯৫৬ সালের সংযুক্ত সোভিয়েত-জাপ ঘোষণায় সোভিয়েত সরকার হাবোমাই ও শিকোতান দ্বীপ দুটিকে জাপানীদের হাতে ফেরত দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর সোভিয়েত সরকার জাপ সরকারের কাছে এই মর্মে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেছেন যে, উক্ত দ্বীপদ্বয় ফেরত দেওয়া হবে যদি জাপ রাষ্ট্রের ভূমি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয় এবং যদি জাপান ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোয়ার্দলভাস্কের ওপরে আমেরিকার ইউ-২ বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর সোভিয়েত সরকার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেছেন যে, জাপানের কোনো ঘাঁটি থেকে ইউ-২ বিমান উড়ে সোভিয়েত আকাশে অনধিকার প্রবেশ করলে সোভিয়েত সরকার সেই ঘাঁটি ধ্বংস করে দেবেন। অবশ্য মার্কিন সরকারও সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, এমন ঘটনা ঘটলে তাঁরাও ওই ঘাঁটিকে "রক্ষা" করার চেষ্টা করবেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু তাতে জাপানের কি মঙ্গল ঘটবে? এক হিরোশিমার জায়গায় হাজার হিরোশিমা জাপানে অনুষ্ঠিত হবে।

সুতরাং জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানের মানুষ যে গণসংগ্রাম চালাচ্ছেন তার মধ্যে কোনো কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র নেই। এই লড়াই জাপানীদের জাতীয় আত্মরক্ষার ও জাতীয় স্বাধীনতারই লড়াই। এই লড়াই

সমগ্র জাপানী জাতির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। এই লড়াই পরিচালনা করার জন্যে যে জাপানী জাতীয় পরিষদ স্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১৪০টি জাপানী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন। শ্রমিক, কৃষক, আপিস-কর্মচারী, নারী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি সকল স্তরের লোক এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন তো বটেই, উপরন্তু সকলেই বেশী বেশী করে রাস্তায় নেমেছেন। যে সকল শিক্ষিত লোক জাপ-মার্কিন সামরিক মৈত্রী সম্বন্ধে আগে শুধু মাথা নেড়ে বলতেন, ইয়াসু উও এনাই, উপায় নেই, উপায় নেই, তাঁরা আজ সক্রিয়ভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। দুই লক্ষ শ্রমিকের শোভাযাত্রার ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনে জাপানীরা দেখেছেন ২০টি জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য গবেষণাগারের ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ১,৫০০ অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পী রাস্তায় নেমে চেঁচামেচি করছেন। ছাত্রেরা ও অধ্যাপকেরা একই সঙ্গে রাস্তায় নেমে যখন হুল্লোড় করেন তখন বুঝতে হবে যে সমগ্র জাতির টনক ভয়ানক নড়েছে। সোশ্যালিস্ট দল, এমনকি গণতান্ত্রিক সোশ্যালিস্ট দলও বলছে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছিঁড়ে ফেল, কিশি পদত্যাগ কর, বর্তমান ডায়েটের অবলোপ চাই। চুক্তির বিরুদ্ধে কত যে দরখাস্ত পড়েছে ও সই সংগ্রহ হয়েছে, সত্যিই তার লেখাজোখা নেই।

ক্রমশই এই আন্দোলন কিশিবিরোধী আন্দোলনের স্তর অতিক্রম করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। ঘন ঘন এই ধ্বনি উঠছে জাপান থেকে মার্কিন সৈন্যবাহিনী অপসারিত হোক, আমেরিকা ওকিনাওয়া ছাড়। সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা জুড়ে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জোয়ার বয়ে চলেছে, তার সঙ্গে জাপানের আন্দোলন এক হয়ে গেছে। জাপানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে এমন কোনো বড় সামাজিক শক্তি নেই। একথা সত্য যে গত সাধারণ নির্বাচনের পর কিশির লিবারাল গণতান্ত্রিক দল জাপানী পার্লামেণ্টের উচ্চ কক্ষে ও নিম্ন কক্ষে, উভয় কক্ষেই সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিল। জাপানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত দ্বিতীয় ডগলাস ম্যাকআর্থার শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বালক কিশিকে এই মর্মে আদেশ দিয়েছিলেন যে, লিবারাল গণতান্ত্রিক দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে আইজেনহাওয়ার জাপানে আসার আগেই পার্লামেণ্টকে দিয়ে জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং আইজেনহাওয়ার জাপানে

আসামাত্র তাঁকে এই অনুমোদন পত্রটি উপহার দিতে হবে। কিন্তু প্রভুর আদেশ পালন করতে গিয়ে কিশিকে জাপানী পার্লামেন্টের রীতিনীতি পদদলিত করে যে নগ্ন ফাশিস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হল, তা দেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করছেন। জাপানী লোকসভা থেকে সমস্ত বিরোধীদলকে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে কিশি রাতারাতি লোকসভাকে দিয়ে "সর্বসম্মতিক্রমে" চুক্তিটি পাশ করিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর নিজের দলের অধিকাংশ সভ্যই ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন নি। তারপর পার্লামেন্টের অধিবেশনকালকে অবৈধভাবে পঞ্চাশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে কিশি আইজেনহাওয়ারের আগমনের পূর্ব মুহূর্তে চুক্তিটিতে পার্লামেন্টের শেষ অনুমোদন সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করলেন।

এই কাজটা কিশি নামেমাত্র করতে পেরেছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তিটিকে জাপানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে ঠেকানো গেল না। কিন্তু এটা খুব ভুল দৃষ্টি। কিশির এই ফাশিস্ত আচরণের পর মুহূর্ত থেকে চুক্তিবিরোধী আন্দোলনটি দশগুণ প্রবলতর হয়েছে। এই আন্দোলনের পক্ষ থেকে এখন আওয়াজ উঠেছে, পার্লামেন্ট কর্তৃক জাপ-মার্কিন সামরিক চুক্তি অনুমোদিত হয়েছে তা মানি না, কিশি পদত্যাগ কর, বর্তমান পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক। এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, কিশির রাজনৈতিক দলে যে আটটি উপদল আছে, তাদের মধ্যে কিশি ভ্রাতৃদ্বয়ের ছটি উপদল ব্যতীত বাকী ছয়টি উপদলই কিশির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিশি যে কতদূর বিচ্ছিন্ন ও একাকী হয়ে পড়েছেন, এটা তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তারপর কিশি আইজেনহাওয়ারকে জাপানে আনতে পারলেন না। এটা তাঁর ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরাট পরাজয়। আইজেনহাওয়ারের জাপান আগমন রুদ্ধ করে দিয়ে জাপানী ছাত্রসংগঠন জেনগাকুরেন একটা বিরাট কীর্তি স্থাপিত করেছেন। বাইশ বছরের ছাত্রী শহীদ মিচিকো কাম্বার স্মৃতিস্তম্ভ সেই কীর্তির সাক্ষ্যস্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে। কিশি যখন মানিলায় তার করে জানালেন যে আইজেনহাওয়ারের জাপান আগমনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি অক্ষম, তখন ১৪,০০০ জাপানী ছাত্রছাত্রীদের যে সপিল মিছিলনৃত্য এই আনন্দবার্তাকে দিকে দিকে ঘোষণা করল তা কবিদের কবিতা লেখার জিনিস। জাইবাৎসুর কর্তারা ও কিশিচক্র ইদানীং জাপানী

ছাত্রছাত্রীদের বুশিদো (জাপানী জাতীয় ভাব) ও ইয়ামাতোদামাশি (জাপানের আত্মা) ইত্যাদি খাটি জাপানী আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদের নৈতিক শিক্ষার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারগতিক দেখে মনে হচ্ছে, ইয়ামাতোদামাশির কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পরম রমণীয় ইয়ামাতোদামাশি সামুরাইয়ের বংশধরদের দেহকে পরিত্যাগ করে আজ যেন জাপানী শ্রমিক-কৃষকের ও জাপানী ছাত্রছাত্রীদের দেহকে আশ্রয় করেছেন বলে মনে হচ্ছে!

চেস্টার বোলস প্রমুখ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া পুরোহিতগণ আজ আমাদের এই আশ্বাস দিতে চাইছেন যে, এশিয়ায় গণতন্ত্রকে দৃঢ়তর করা এবং এশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশকে বন্ধুভাবে সাহায্য করাই আমেরিকার লক্ষ্য। এটা হলে অবশ্যই খুব ভাল হত। ১৮৫০ সালে কমোডোর পেরীর প্রশস্তি গান করে ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখেছিলেন :

I chant commerce opening, the sleep of ages
having done its work—races
reborn, refresh'd ;
Lives, works, resumed—the object I
know not—but the old, the Asiatic
resumed as it must be...

মহাকবি হুইটম্যানকে স্মরণ করে আমরা এশিয়াবাসীরা আন্তরিকতার হিত একথা বলতে পারি যে, যদিও এশীয় জাগরণে স্টারস অ্যাণ্ড স্ট্রাইপসের জিটিভ ভূমিকাকে আমরা স্বীকার করি না, তবু আমরা এশিয়াবাসীরা শ্চাত্যের সহিত অসহযোগিতা করতে চাই না এবং পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণা াষণ করতে চাই না। জাগ্রত এশিয়াবাসী আমেরিকার তথা সমগ্র পাশ্চাত্যের সহিত বন্ধুভাবেই বসবাস করতে চায়। জাগ্রত এশিয়াবাসী চায় যে, আমেরিকা এশিয়াবাসীদের জাতীয় স্বাধীনতার, গণতন্ত্রের ও অর্থনৈতিক বিকাশের কামনাকে মান্য করুক। কিন্তু জাপানের ও আমেরিকার এ কী "বন্ধুত্ব" আমরা দেখছি দ্বিতীয় ডগলাস ম্যাকআর্থার ও নোবুস্থকে কিশির পারস্পরিক ষড়যন্ত্রে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই "বন্ধুত্বের" স্বপ্নই কি হুইটম্যান দেখেছিলেন? আজ জাপানী গণতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারবার্তায় যে ধরনের নগ্ন সীনিসিজম পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে, তা দেখে

চেস্টার বোলসদের "গণতান্ত্রিক" উপায়ে ভারত বিজয়ের চেষ্টা সম্বন্ধে ভারতবাসীরা যদি একটু সন্দেহ বোধ করে, সেটা খুব দোষের হবে কি? স্পষ্টতই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ চাইছে জাপানী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে সেখানে একটি সামরিক ফাশিস্ত রাজ প্রতিষ্ঠিত করতে।

যাতে এটি না ঘটতে পারে সেইজন্যে জাপানী জাতি আজ অদ্ভুত প্রজ্ঞার সহিত অপরিসীম বিক্রমে লড়ছেন। ফাশিস্ত রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে যে সকল সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান থাকা দরকার, সেগুলি জাপানে আজ নেই। চুক্তিবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিশি হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছেন বটে কিন্তু এই আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া কিশির পক্ষে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সুতরাং মাভৈঃ! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে জাপানী জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে গভীর রাজনৈতিক পরিপক্কতার সহিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তার জয় অনিবার্য। এই লড়াই সমগ্র এশিয়ার স্বার্থের অনুকূল, আমেরিকার জনগণের স্বার্থের অনুকূল এবং প্রকৃত জাপ-মার্কিন বন্ধুত্বেরও অনুকূল। ধন্য জাপান!

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র